অমর
চিত্র
কথা
বিশেষ সংখ্যা
রামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত
শ্রী রামকৃষ্ণ
সাধু ও গোয়ালিনী

শ্রী রামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের নতুন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, " শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটা হল ধর্মের মূর্ত চেহারা। তাঁর জীবন আমাদের ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ করে দেয়।" বার্ট্রাণ্ড রাসেল আশা করেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবনে জ্ঞান প্রজ্ঞায় পরিনত হবে। তা' না হলে জ্ঞানের বিস্তার দুঃখকেই দীর্ঘতর করবে। রামকৃষ্ণের জীবনে আমরা সেই প্রজ্ঞার সন্ধান পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল তাঁর জীবনের মতনই সরল... অনেক সময় গল্পের ছলে। বিশ্বাস আর ভক্তি সম্পর্কীয় তাঁর গল্পগুলো আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। যদিও মানুষের দুর্বলতা আর ত্রুটির কাহিনীগুলো আমাদের মৃদু হাসির খোরাকও জোগায়।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা এই মহৎ জীবনের এক সংক্ষিপ্ত ছবি আর তাঁর বলা কিছু গল্প প্রকাশ করলাম।

'অমরচিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন/৩৪-৮০৪৩

Published by H G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor: Anant Pai Scripts: Gayatri Madan Dutt Cover: Madhu Powle

SRI RAMKRISHNA ---- Artworks: Souren Roy
THE LEARNED PANDIT ---- Artworks: Anuradha Vaidya
THE PANDIT AND THE MILKMAID ---- Artworks: Pratap Mulick

শ্রীরামকৃষ্ণ
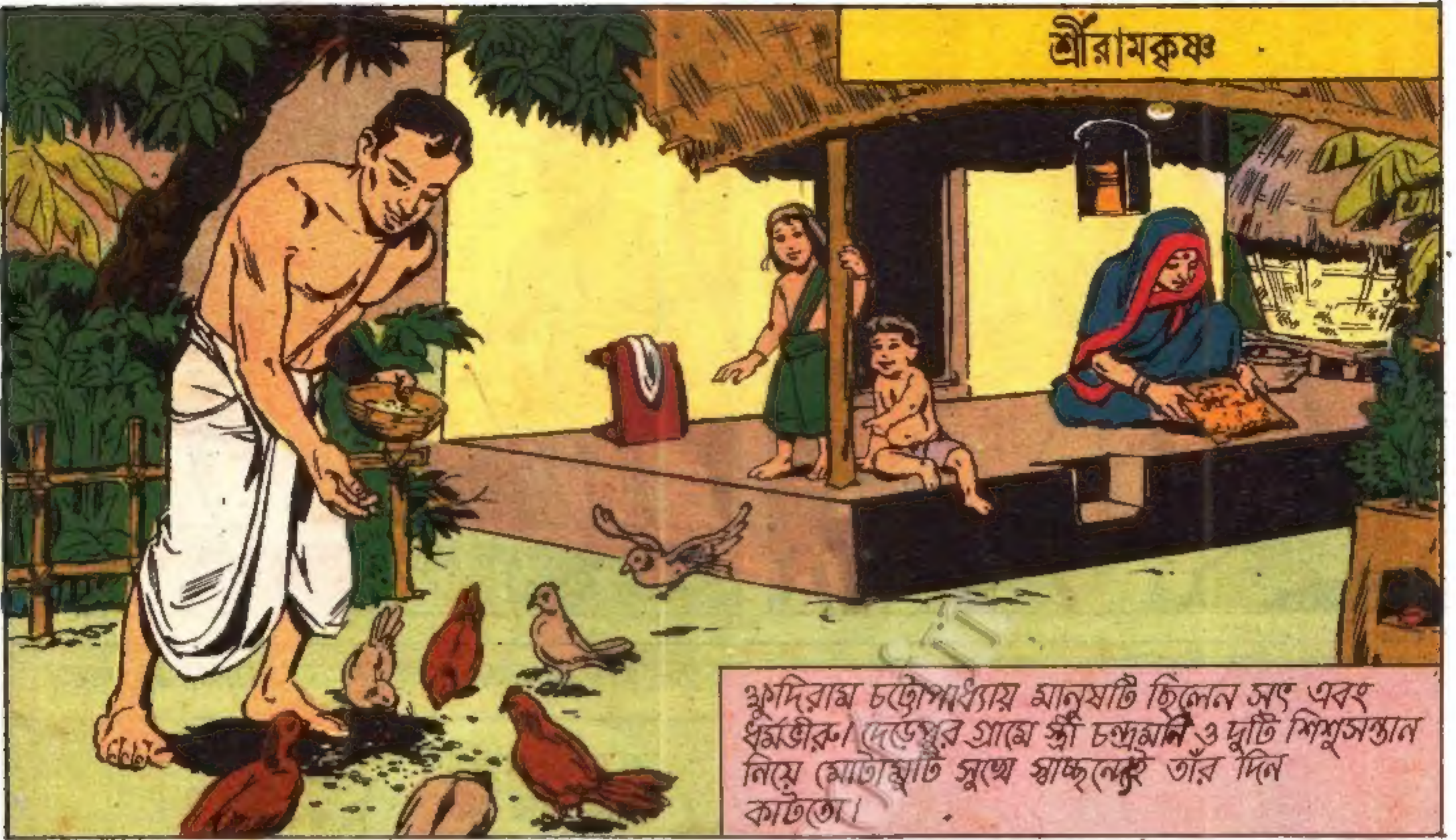
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মানুষটি ছিলেন সৎ এবং ধর্মভীরু। দেড়েপুর গ্রামে স্ত্রী চন্দ্রমণি ও দুটি শিশুসন্তান নিয়ে মোটামুটি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর দিন কাটতো।

ক্ষুদিরামবাবু! ভুলে যাবেন না— আমি কে! দরকার হলে আপনাকে সপরিবারে ভিটে ছাড়া করবো।
আমাকে ওসব ভয় দেখাবেন না!

একজন গরীব মানুষ, সারা দিন জমি চাষ করে আধপেটা খায়—তার বিরুদ্ধে আমি মিথ্যে বলবো? কিছুতেই না!
গ্রামের সর্বশক্তিমান মানুষটিকে ক্ষুদিরাম ভীষণ রাগিয়ে দিলেন।

এর মূল্যও তাঁকে দিতে হলো। রামানন্দ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যে মামলা আনলেন, সাজানো মামলায় তাঁকে হারিয়ে বিষয়-সম্পত্তি সব কেড়ে নিলেন।
বাড়ি গেল, গরু গেল। আমাদের কিছুই রইলো না...
তা কেন? আমাদের মনের জোর ওরা কেড়ে নিতে পারে নি— সেটাই আসল।

এক বন্ধুর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম কামারপুকুরের দিকে যাত্রা করলেন।
আর দেড়েপুরে ফিরতে পারবো না।
হয়তো সেটাই আমাদের পক্ষে ভালো হবে।

কামারপুকুরে তাঁরা নতুন সংসার পাতলেন। এই নতুনকে জয়ধ্বনি করতে ঘরে এলো আরও দুটি শিশু, দুয়ের সঙ্গে যোগ হলো আরও দুই।

শেষের সন্তানটিই আমাদের রামকৃষ্ণ; ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল গদাধর বা গদাই।
এই যে গদাই, তোমাকেই খুঁজছিলাম। এখানে একা বসে কী করছো?

এবার খেলা ছেড়ে পড়তে বসো। তোমাকে সোজা অঙ্ক জিজ্ঞেস করছি।

তেত্রিশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে কতো থাকে? চটপট বলো।

অ্যাঁ... কুড়ি... না... উনত্রিশ ?

আঠাশ! তোমার এতো স্মরনশক্তি — যে কোনও শ্লোক একবার শুনলেই আগাগোড়া বলতে পারো – অথচ অঙ্কের বেলায় কিছুই মনে থাকে না! যতোবারই শোনাচ্ছি, ততোবারই ভুল উত্তর দিচ্ছো!
অঙ্ক আমার ভালো লাগে না।

দ্যাখো বাবা, মূর্তিটা কেমন হয়েছে? এটাকে দেখলে কৃষ্ণ বলে মনে হয় না? আমি অনেক মাটি এনেছি, আরও মূর্তি গড়বো।
সুন্দর হয়েছে।

গদাধরকে সবাই পছন্দ করতেন।
গদাই, আমাদের একটা গান শোনাও!
না, ও এখন সাধু সাজবে।

দেখেছিস, কী চমৎকার সাধু সেজেছে!
কী ভাবে মিষ্টিগুলির দিকে তাকাচ্ছে, দ্যাখ!

কিন্তু গদাধরকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাঁর দাই-মা ধানী।
গদাই, তোর যখন পৈতা হবে, কার কাছ থেকে প্রথম ব্রতভিক্ষা নিবি?
তোমার কাছ থেকে। তুমিই তো আমাকে প্রথম কোলে নিয়ে আদর করেছো, তাই না?

ঠিক কথা, তোকে আমিই প্রথম কোলে করেছিলাম। তোর মুখের 'মা' ডাক শুনতে আমার কতো ভালো লাগে। ভিক্ষার কথাটা—
আমার ঠিক মনে থাকবে। তোমার কাছেই প্রথম ভিক্ষা চাইবো।

ছোটবেলার দিনগুলি, হাসিখুশিতেই কেটে যায়। গদাই কিন্তু মাঝেমধ্যে সব ভুলে কোনও নির্জন জায়গায় চলে যায়।

একদিন চাল ভাজা খেতে খেতে যখন তিনি মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছেন, হঠাৎ আকাশটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর —

পাখি! দুধের মতো সাদা। কালো মেঘ আলো করে উড়ে যাচ্ছে! কী সুন্দর!

আহ্!

কয়েক জন পড়শীর চোখে পড়লো, এক জন মানুষ—
গদাই! ওর কী হয়েছে?
অজ্ঞান হয়ে গেছে! ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

বাড়িতে —
হঠাৎ কী হয়েছিল?
কিছু না। আকাশ দিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল, দুধের মতো সাদা! তারপর আমি যেন অনেক দূরে, অন্য কোথাও... ভয়ানক আনন্দ হচ্ছিল! তারপর আর কিছুই মনে নেই।

দিন যেতে লাগলো। হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। বাবাকে হারিয়ে গদাধর যেন কেমন হয়ে গেলেন।
গদাই না? ওখানে কী করছে?
বেচারা! বাবার জন্য মন খারাপ করে একা বসে আছে।

গদাধরের বয়েস যখন ন বছর, তখন তাঁর উপনয়ন হলো। যজ্ঞ শেষ হলে —
এখন তিন দিন তোকে ব্রতভিক্ষা নিতে হবে। কার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নিবি?
আমার কথা মনে আছে তো? যা খেয়ালী ছেলে!

দাই মার কাছ থেকে।

বড় ভাই রামকুমার অবাক হয়ে গেলেন।
তোর দাই মা ধানী? উনি তো কামারের মেয়ে! এটা ঠিক নয় – ব্রতভিক্ষা নিতে হয় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে।

ওঁকে কথা দিয়েছি। কথার নড়চড় হলে গলা থেকে পৈতে ফেলে দিতে হবে – এখন তুমিই বলো—

রামকুমার আবার অবাক হলেন।
মা, আমাকে ভিক্ষা দাও!
আমার ছেলে!

কিছুদিন পর – চারদিকে শিবরাত্রির উৎসব! গ্রামে 'শিবায়ন' পালা হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে —
গদাই, তোকে শিবের পার্ট করতে হবে। আসল শিব...

... হঠাৎ বিছানা নিয়েছে — নট্ নড়ন চড়ন!
আমাকে...আমি ... ঠিক আছে, আমিই শিব সাজবো!

তারপর —
খোঁপায় চাঁদ — চমৎকার মানাবে।
একটু সবুর! গায়ে ছাই মেখে নিচ্ছি।
সব ঠিক আছে তো?

গদাধর যখন আসরে ঢুকলেন, চারদিক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।
আমাদের গদাই! এ যে সাক্ষাৎ মহাদেব?
চোখের দিকে তাকান! কী যেন ওর ওপরে ভর করেছে!

সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু গদাধর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।
দাঁড়িয়ে আছো কেন? এবার শুরু করো!

যাত্রা দলের মাতব্বরেরা সবাই মঞ্চে চলে এলেন।
এ কী! ছেলেটার কোনও হুঁশই নেই! গদাই, ও গদাই! শুনতে পাচ্ছিস?
গদাই এদিকে তাকা!
কোনও কথাই কিন্তু তার কানে পৌঁছাচ্ছে না।

গদাধরকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হলো।
ওর মুখে একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন?
ওর ওপর কোনও দেবতা ভর করেছেন।

যেখানে শিবের গান, সেখানেই গদাধর। দাদা রামকুমার কিন্তু তাতে খুশি নন।
সতেরো বছরে পা দিয়েছে, পড়াশোনার কী হচ্ছে! ওকে কলকাতায় নিয়ে আমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো।

পরে —
গদাই, আমার সঙ্গে কলকাতায় চল।
ভালোই হলো, শহর দেখবো!

কামারপুকুর থেকে কলকাতায়। ভালোও লাগছে, আবার ...

...কতো জনকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে! সঙ্গে শুধু বড় ভাই।
কী বিরাট শহর! কতো মানুষ, সবাই ব্যস্ত!
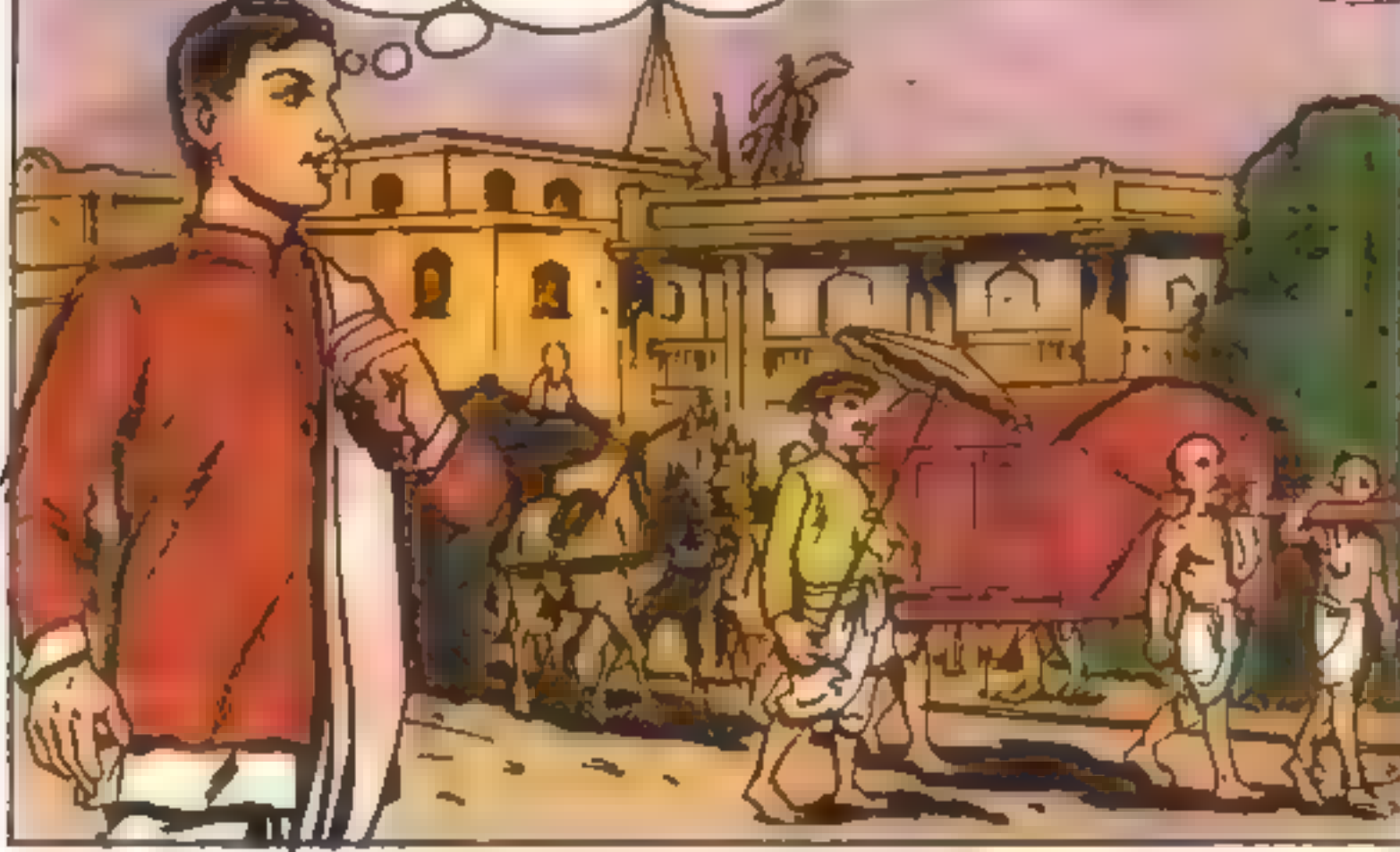
কিন্তু যে জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছে, সেই লেখাপড়ার কী হবে?
পড়ার সময় কী ভাবছিস? ভালো করে লেখাপড়া শিখবি, তবে না নিজের পায়ে দাঁড়াবি?

স্কুলের পড়া আমার ভালো লাগে না। এর চেয়ে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে আমার ভালো লাগে।
রামকুমার ভাইকে ইচ্ছে মতো চলতে দিলেন, অর্থাৎ— পড়াশোনা বন্ধ।

কিছু দিন এ ভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রামকুমার দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পুরোহিতের কাজ পেয়ে গেলেন। একদিন পোটলাপুঁটলি বেঁধে দু'ভাই সেদিকে রওনা হলেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রানী রাসমনির টাকার অভাব ছিল না। জামাতা মথুরমোহনের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন থেকেই এই চোখ জুড়ানো মন্দিরটি সবাইর প্রশংসা কুড়াচ্ছিল।
কী সুন্দর! তাই না, দাদা?

আমাদের থাকার ঘরটাও খুব ভালো— অনেকখানি জায়গা!

দেখে যাও দাদা, সামনেই গঙ্গা।

কলকাতা থেকে মাত্র চার মাইল, কিন্তু কতো তফাৎ! ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে! ভাগ্নে হৃদয় যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন—
গঙ্গা নদী, দেখলেই চোখ জুড়ায়। আয় হৃদয়, এখান থেকে মাটি নিয়ে শিবের মূর্তি গড়ি।
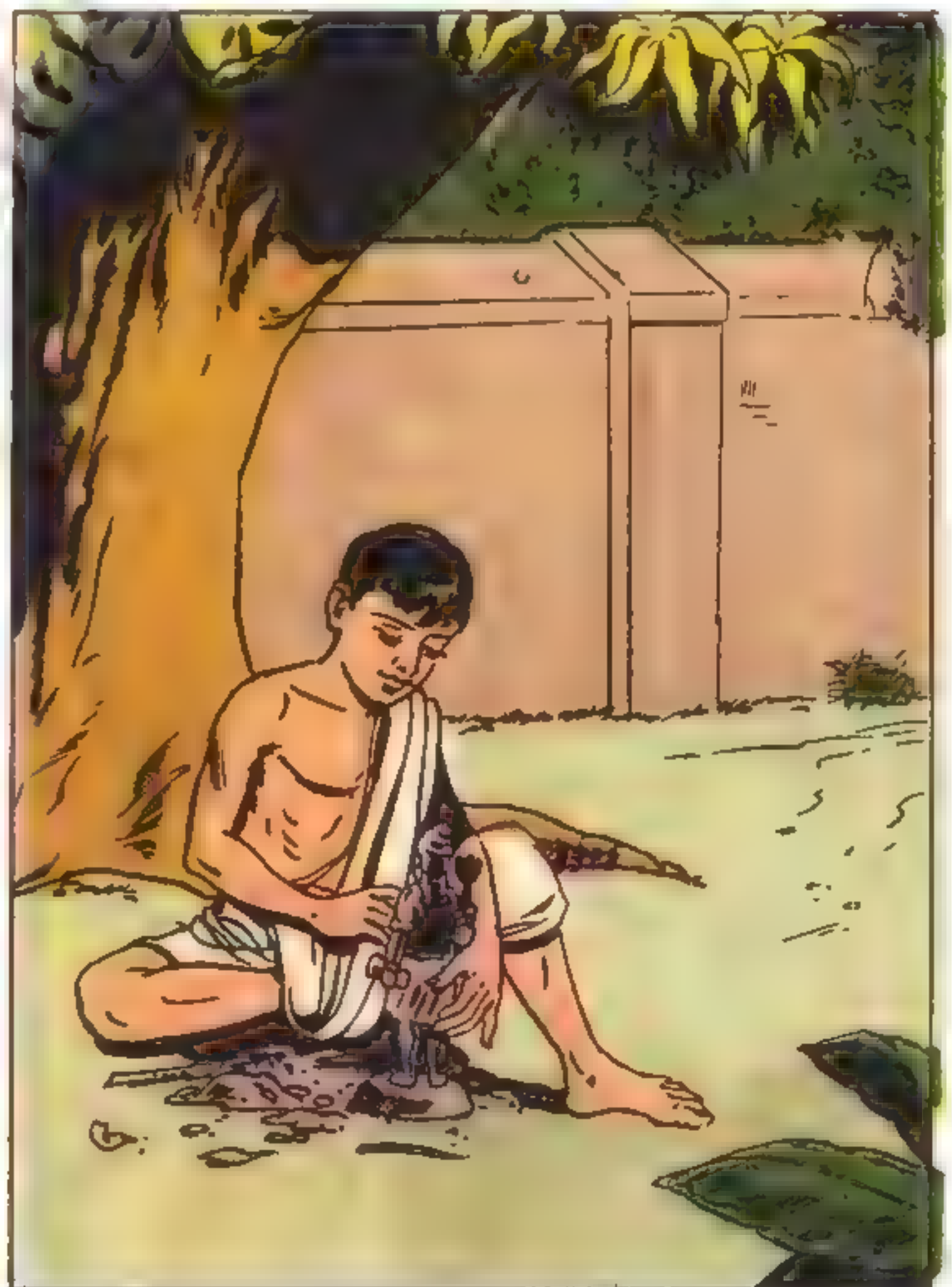
মথুরমোহন ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন।
কী সুন্দর! গদাই, কে তোমাকে এই সুন্দর মূর্তিটি দিয়েছে?
আমি নিজে বানিয়েছি।

মথুর রানী রাসমনিকে মূর্তিটি দেখালেন।
সত্যিই সুন্দর! যেন জীবন্ত ঠাকুর, আমাদের ভেতরটা দেখছে!
ছেলেটা আর দশ জনের থেকে একেবারে আলাদা— যেন মন্দিরের একটা অংশ!
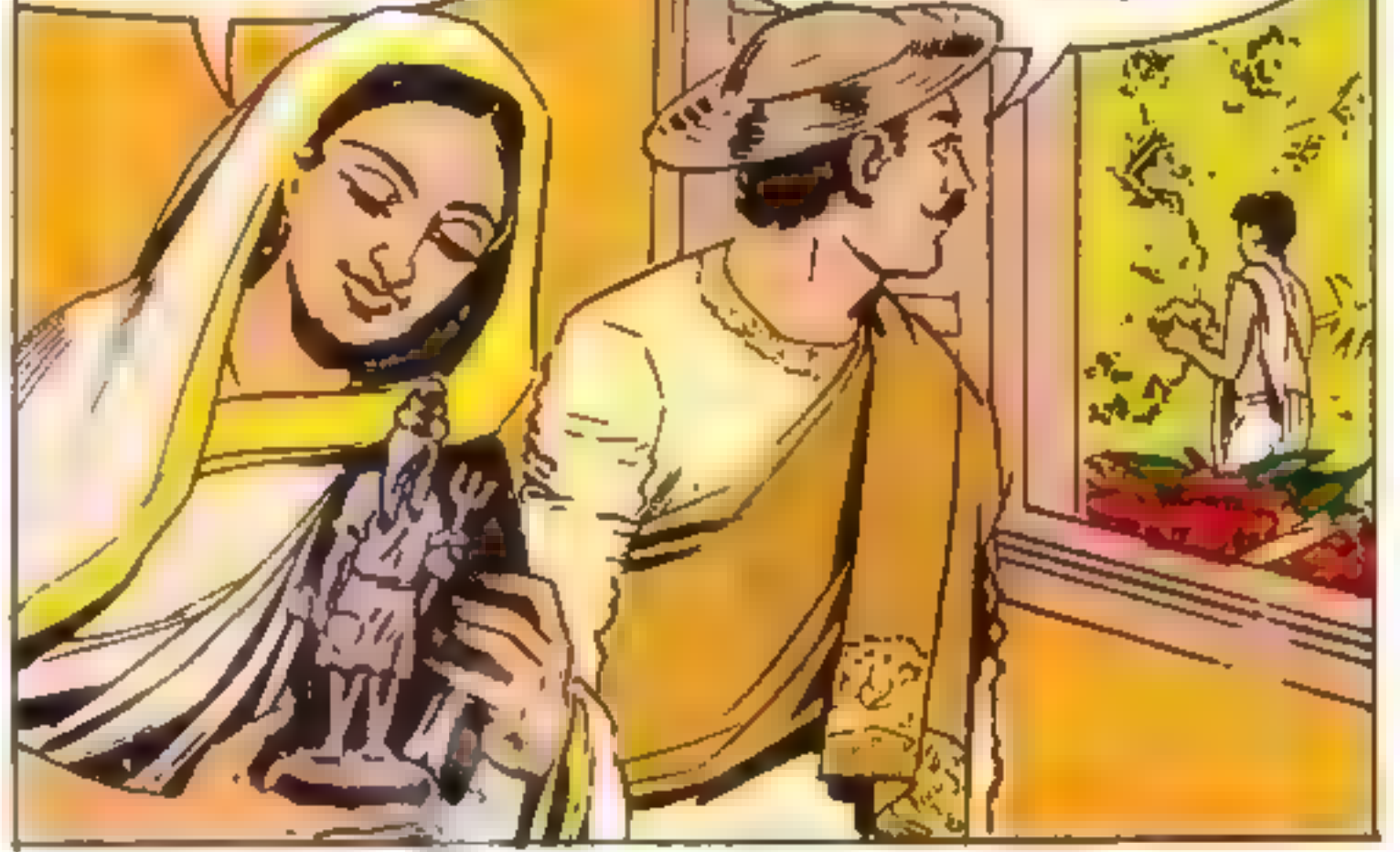
মথুর আর সময় নষ্ট করলেন না।
মন্দিরে আরও সেবায়েত দরকার—কাজটা গদাধরকে দিতে চাই।
মথুরবাবু, আমার ভাই বড় খেয়ালী। কোনও কাজেই ও বেশি দিন টিঁকতে পারে না।
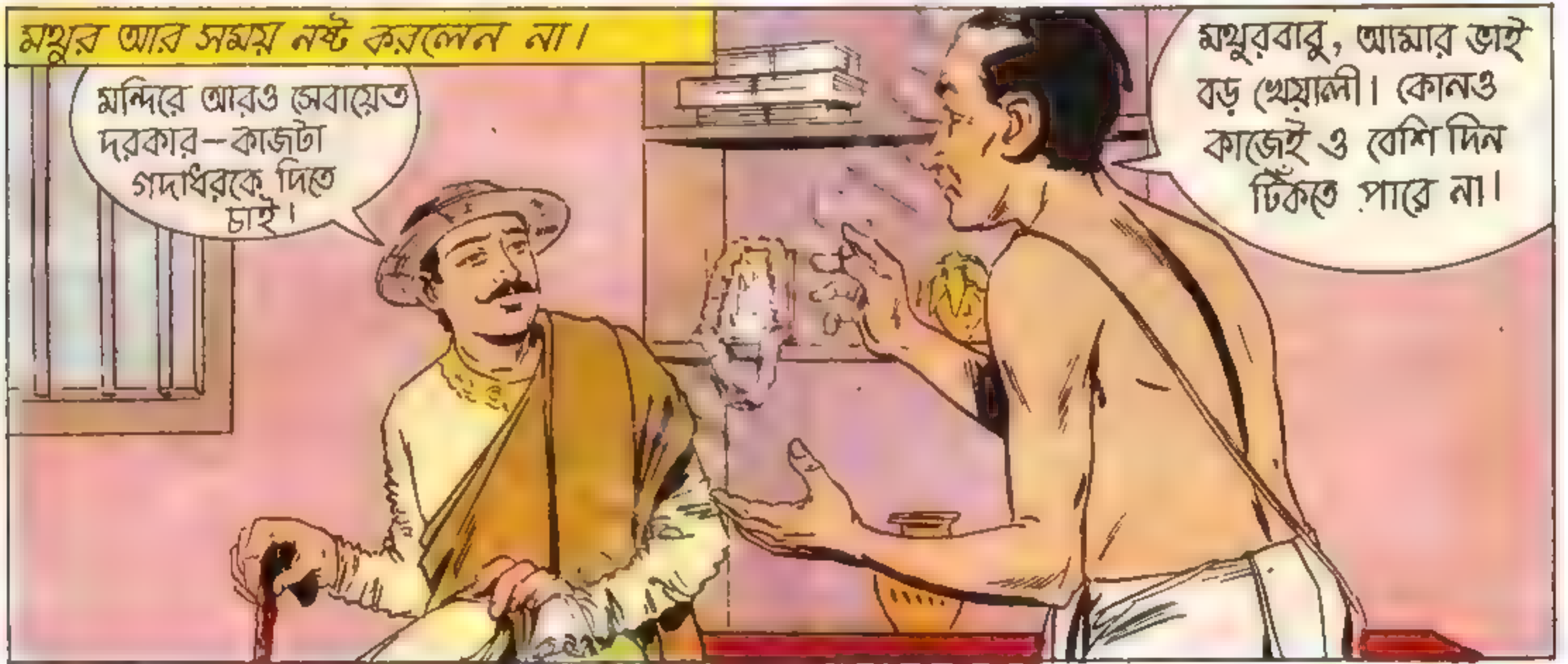
দাদার কাছ থেকেই গদাধর জানতে পারলেন মথুরবাবু তাঁকে খুঁজছেন। সেই থেকে ধুতি-চাদর পরা লোকটিকে দেখতে পেলেই—
গদাই! গদাই! থামো! একটা কথা··· ঐ যা! আবার পালালো!

গদাধরের ব্যবহারে ভাগ্নে হৃদয় অবাক হয়ে গেল।
ওকে দেখলেই পালাও কেন ? তুমি তো সব সময় ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকো- পুরুত হলে তো তাঁদেরই পুজো করবে।
এখানে পুরুতগিরির অনেক ঝক্কি রে, হৃদয় ! ওঁদের গা-ভর্তি দামী গয়না — আমাকেই পাহারা দিতে হবে !
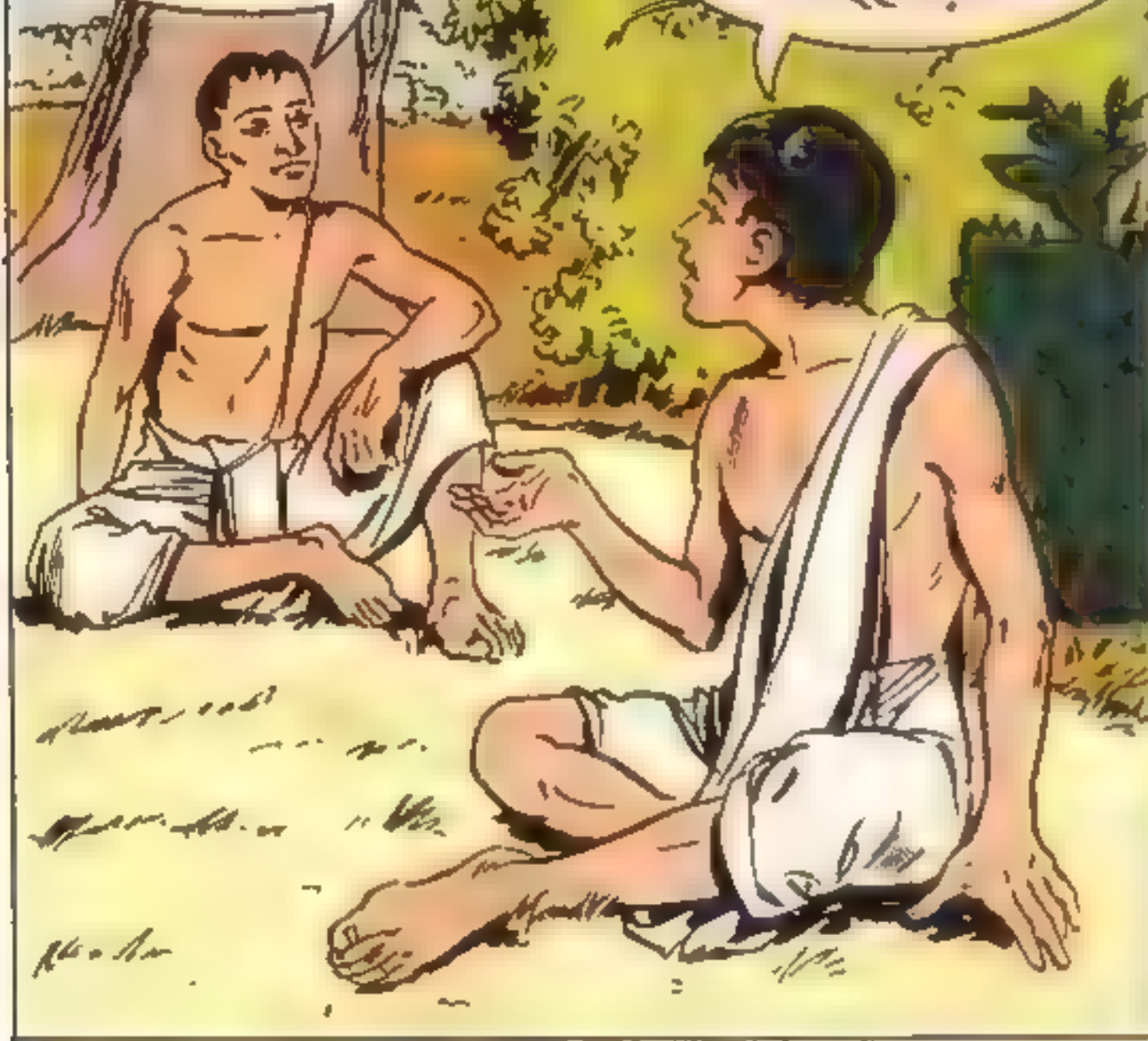
তবে তুই যদি গয়নাগুলিকে পাহারা দিস, আমি পুরুত হতে রাজি আছি।
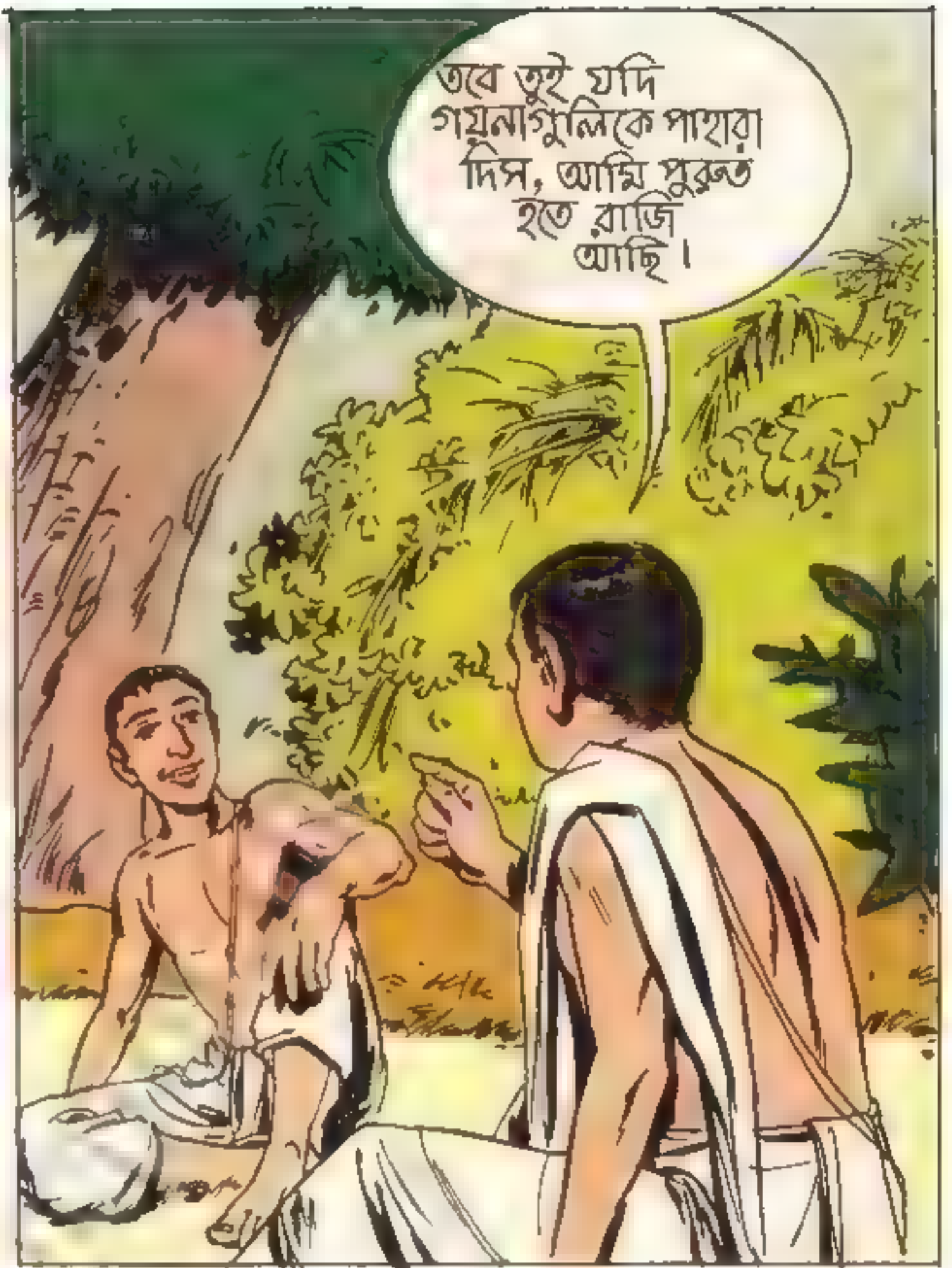
হৃদয় রাজি হলেন। রামকুমার কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, গদাধর দাদাকে সাহায্য করতে লাগলেন।
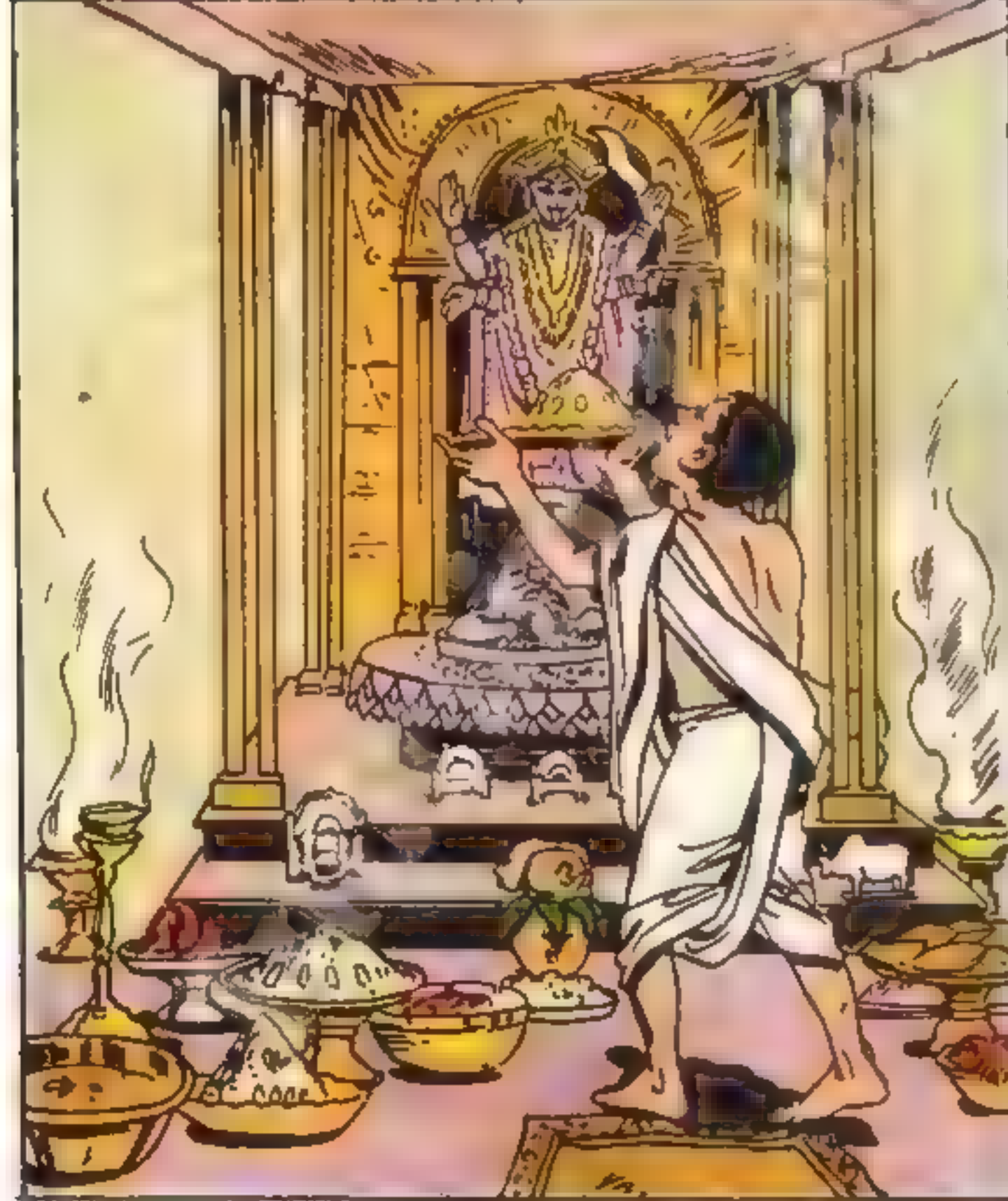
আমার মনের ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। এখন থেকে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের— এখান থেকে ও এক পা-ও নড়বে না!
রামকৃষ্ণ নামটি খুব সম্ভব মথুরবাবুর দেওয়া। ধীরে ধীরে এই নামেই তিনি মন্দিরের ভিতরে এবং বাইরে পরিচিত হলেন।

একদিন রানী রাসমণি জামাতাকে নিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে হাজির হলেন।
বাবা, মন্দিরে যে নারায়ন মূর্তিটি আছে তাঁর একটা পা ভেঙে গেছে। পন্ডিতরা বলছেন, মূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।
আপনি বলুন, আমরা কি করবো?

রামকৃষ্ণ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন. তারপর ---
রানী মা! আপনার জামাইদের কারও পা ভেঙে গেলে কি তাঁকে জলে ভাসিয়ে দেবেন?

মূর্তির ভাঙা পা-টি মেরামত করে নিন. তারপর আগের মতো পূজা করুন।

রামকৃষ্ণ নিজেই ঐ কঠিন কাজের ভার নিলেন। এতো চমৎকার তাঁর হাতের গুন যে, ভাঙা পায়ের কোনও চিহ্নই আর রইলো না।
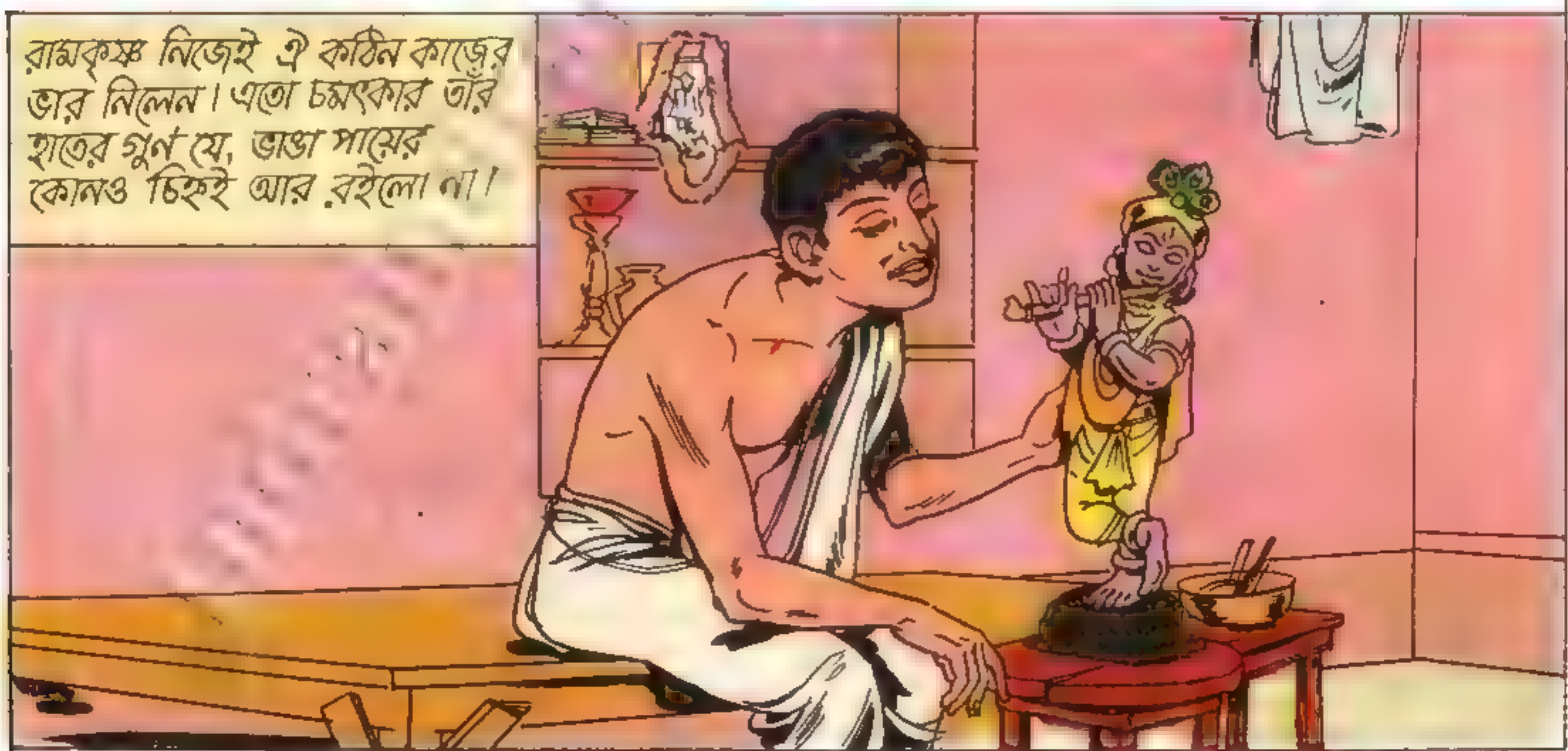
সময় কখনও স্থির থাকে না। হঠাৎ কয়েক দিনের অসুখে রামকুমার মারা গেলেন। বাবা নেই, দাদা ছিলেন; এবার তিনিও চলে গেলেন।
দাদাই ছিলেন আমার সব, এখন তিনিও নেই। কিছুই কি থাকে না? আজ আছে, কাল নেই— সব মিথ্যে?
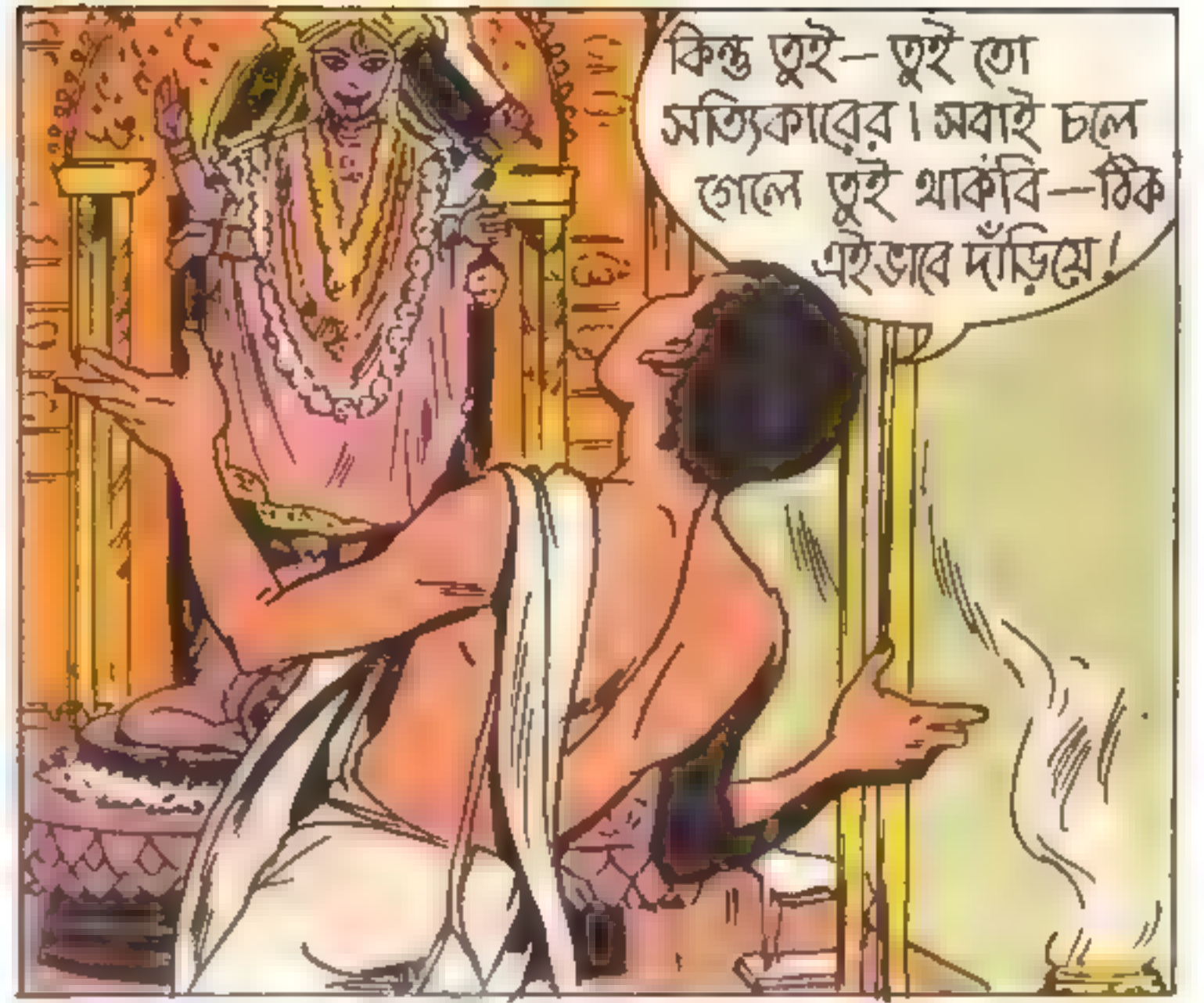
কিন্তু তুই— তুই তো সত্যিকারের। সবাই চলে গেলে তুই থাকবি—ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে!

কিন্তু তুই তো রক্তমাংসের নোস, শুধু পাথরের! সত্যিই কি তুই পাথর? এ কী করে হয়? কতোবার ভক্তদের ডাক শুনে তুই দেখা দিয়েছিস। আমাকেও দেখা দে, মা! একবার দেখা দে!

আহার-নিদ্রা ভুলে রামকৃষ্ণ কেবল কালীকেই ডাকছেন, কিন্তু অন্য দিক থেকে কোনও সাড়া শব্দই আসে না।

পর দিন যেতে লাগলো…

… তারপর, একদিন—
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মন্দিরের ঘন্টা বাজছে! আর একটা দিন চলে গেল, কিন্তু তোর দেখা পেলাম না!

দেখা দে মা, একবার দেখা দে!
বেচারা! এই বয়েসেই মাকে হারিয়েছে। ভগবানের কি বিচার!

মন্দিরের ভিতরেও একই দৃশ্য। কখনও বা জ্ঞান হারিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন।
উন্মাদ! এঁকে কী জন্য মন্দিরের পুরোহিত করা হয়েছে?

মথুর কিন্তু মানুষটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় তিনি কখনও কান দিতেন না।
আবার বাড়াবাড়ি করছে! আপনার হুকুম পেলে এখনই ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিই!

ঐ চেষ্টাটি করবেন না। উনি যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন। এটা রানী-মার ইচ্ছে — আমার আদেশ।

দিনের পর দিন যেতে লাগলো, রামকৃষ্ণ পাগলের মতো কালীর কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।
কেন দেখা দিচ্ছিস না? তুই কী এতোই পাষাণী? সন্তানের ডাক শুনতে পাস না? আমার সমস্ত শরীর যন্ত্রনায় বেঁকে যাচ্ছে, আর তুই ...

...এই ভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ?

তোকেই যদি না পেলাম, এই ভালো!
এর পরেই কিন্তু অন্য ঘটনা, অন্য দৃশ্য। রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কাছে যেমন বলেছিলেন—

"হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সব অদৃশ্য হয়ে গেল— দরজা, জানালা, মন্দির। আমার সামনে শুধু একটার পর একটা আলোর জ্যোতি...

"... তারপর আলোর ফুলকিগুলি একটাই আলোর সমুদ্র—এই ভাসছি, ঐ ডুবছি : আর নিশ্বাস নিতে পারছি না।"
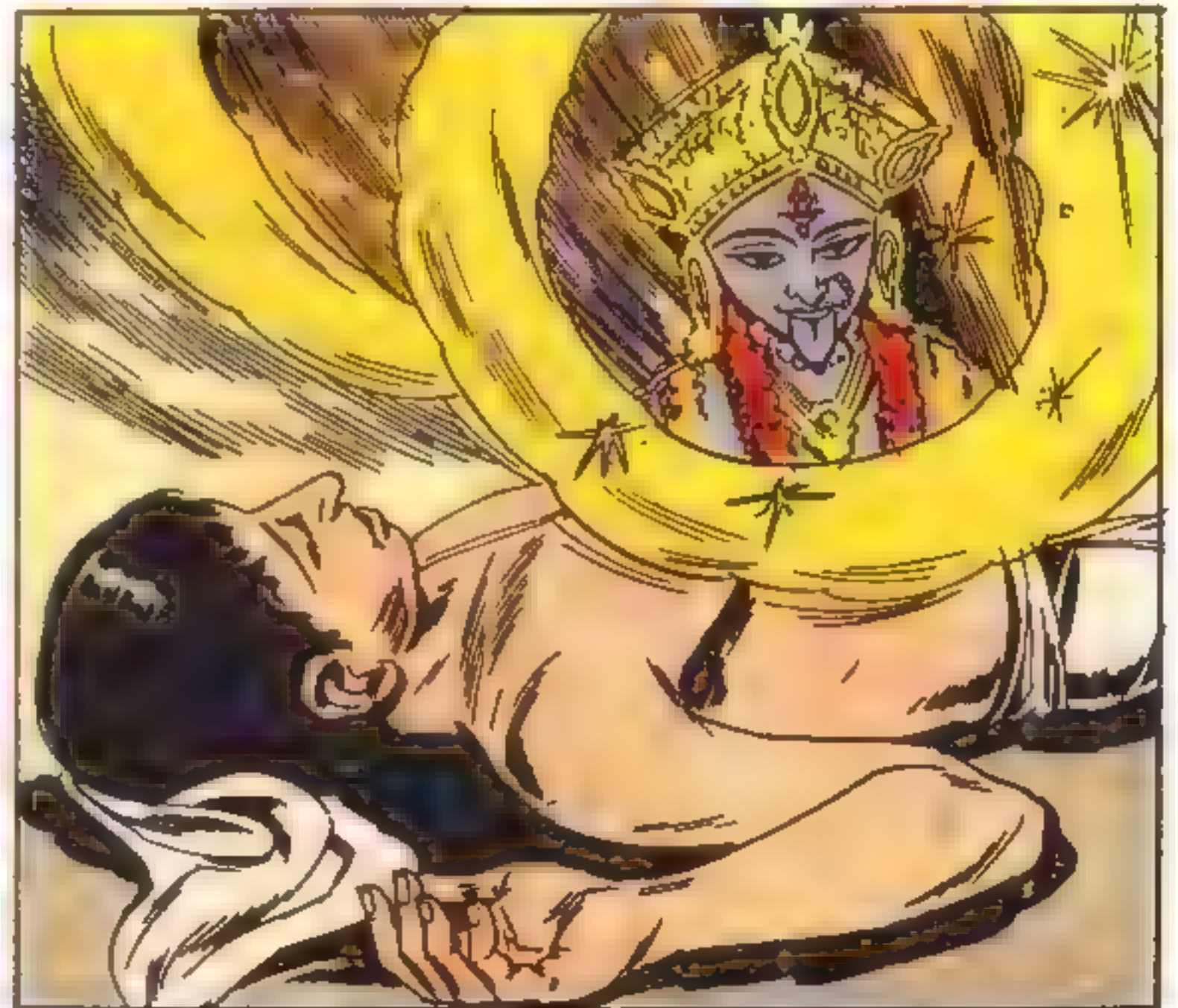
জ্ঞান ফিরে আসতেই —
মা! মা...

এতো দিনে দেখা দিলি! নিজের ছেলেকে এতো কষ্ট দিলি কেন মা?
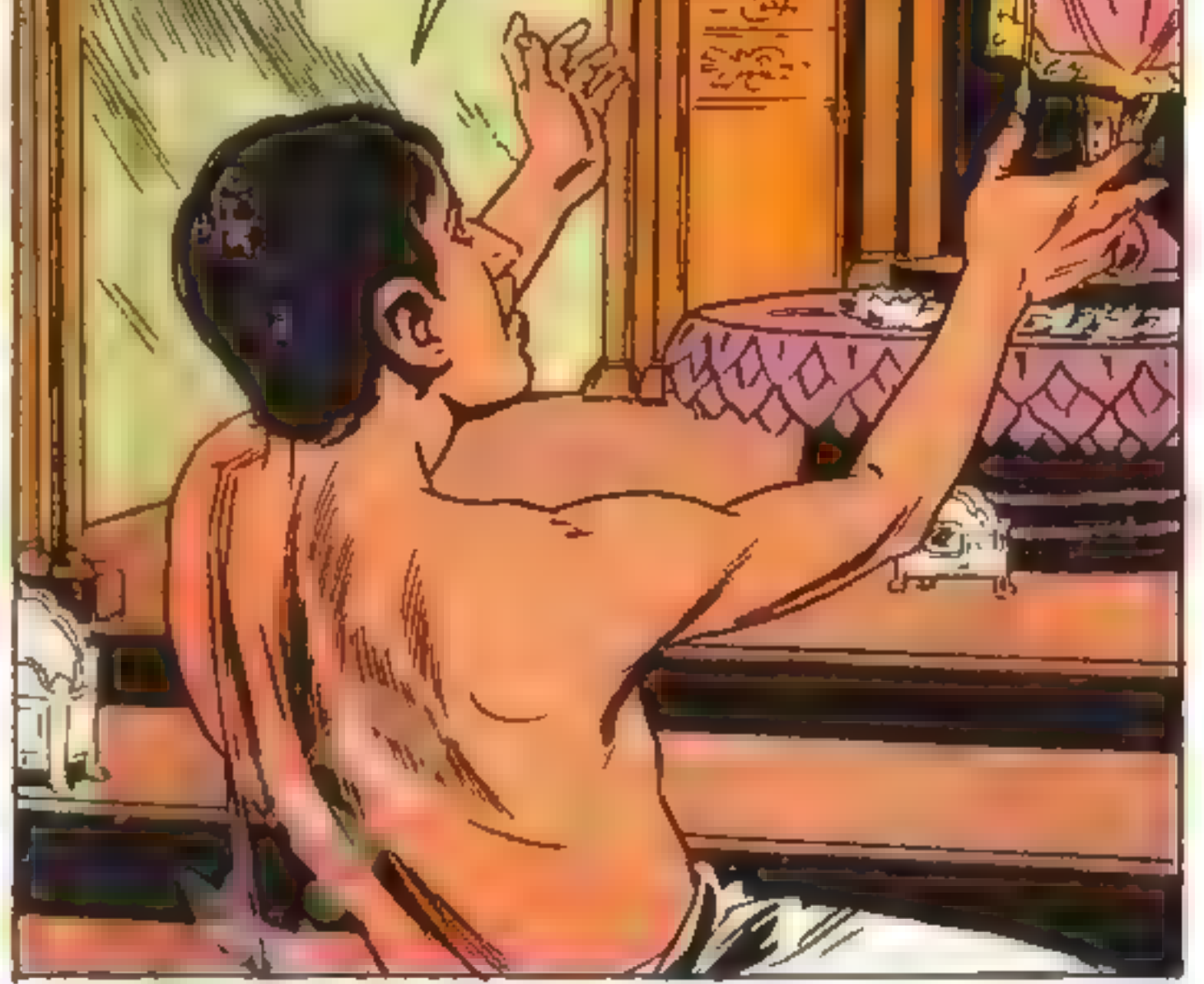
রামকৃষ্ণের কালী এখন আর পিতল বা পাথরের মূর্তিই নন, তিনি রক্ত-মাংসের মানবী। তাঁর খিদে আছে, তেষ্টা আছে — তবে অনেক সাধতে হয়...
এবার খেয়ে ন্যাল!
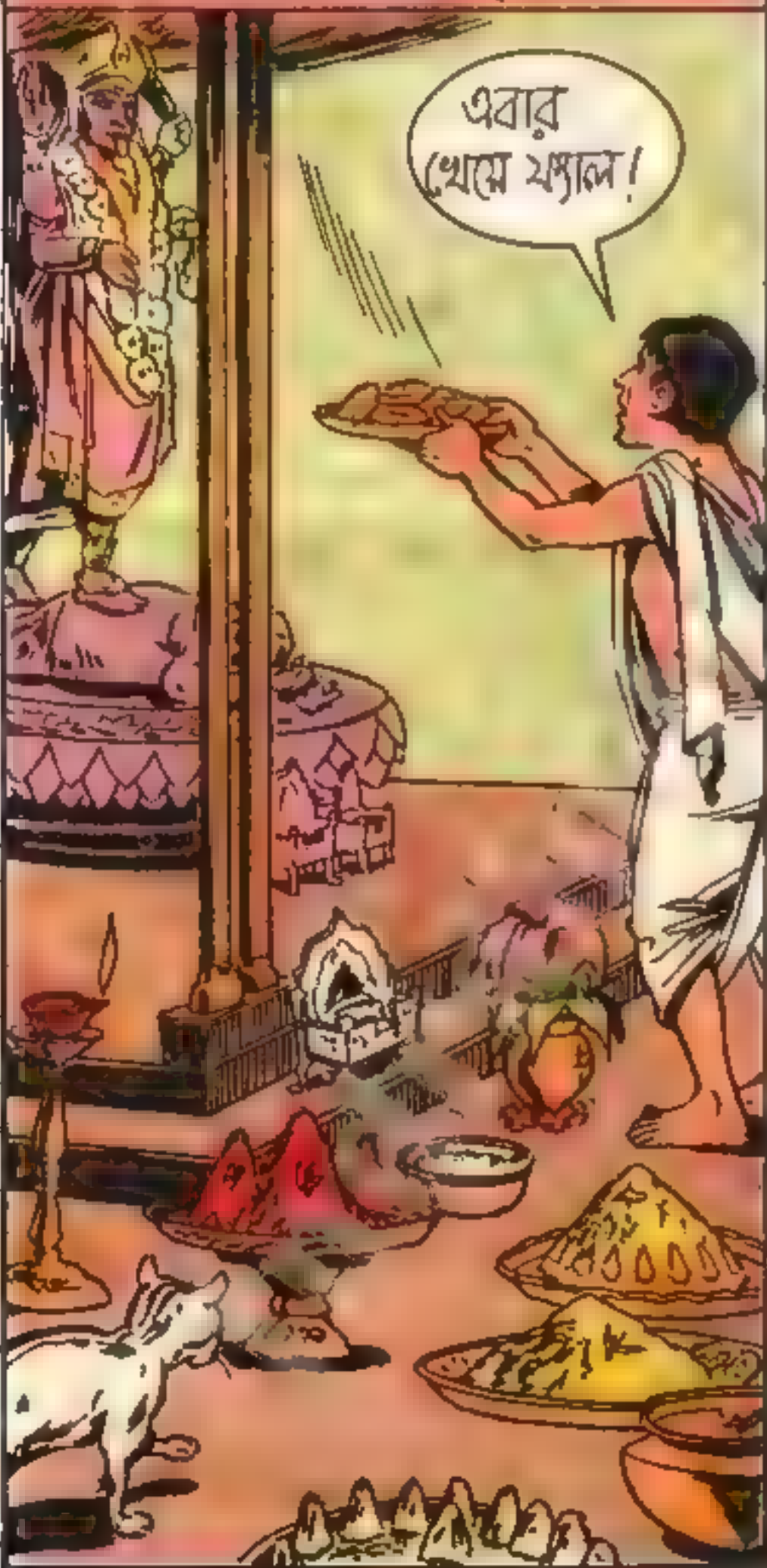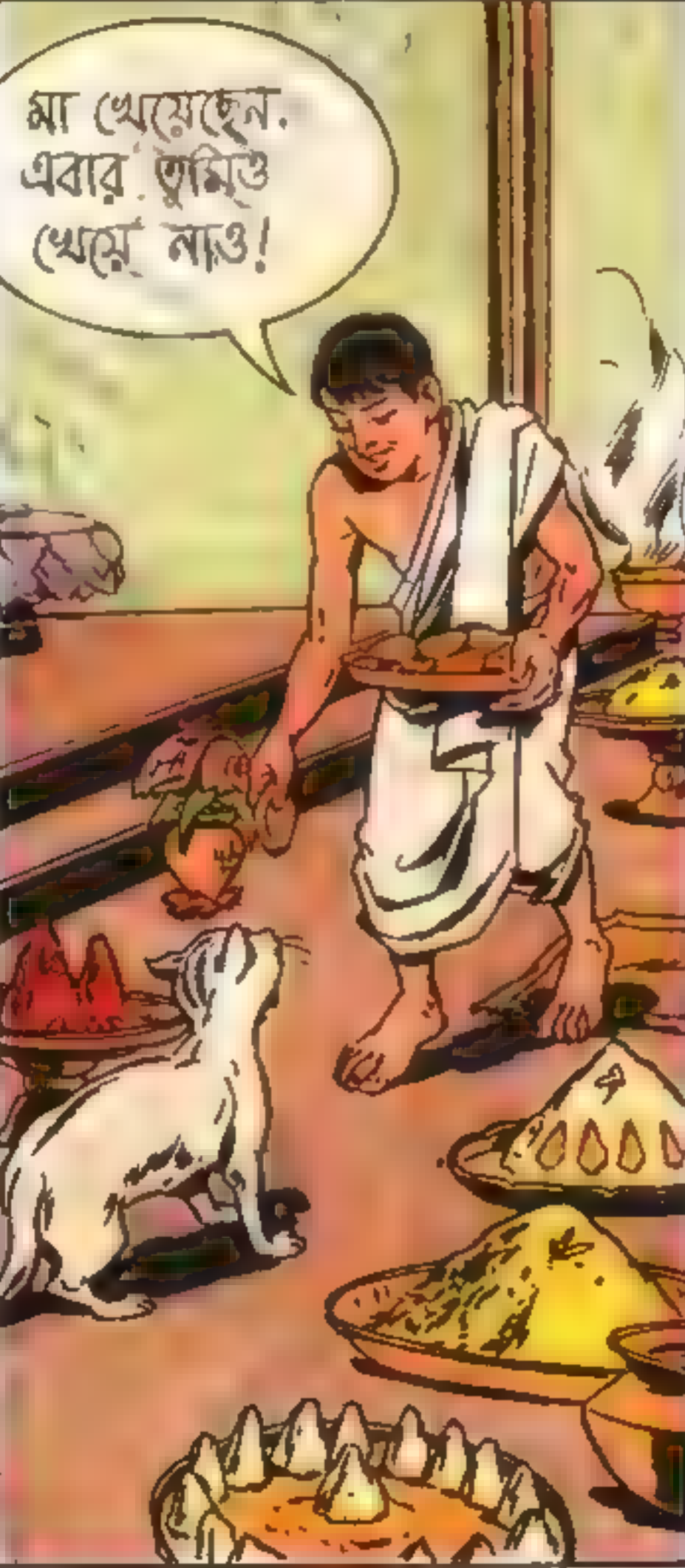
... দেবীর খিদে পায়, তেমনি পশুপাখিরও খিদে পায়। তা ছাড়া, ওরাও তো দেবতারই অংশ —
মা খেয়েছেন. এবার তুমিও খেয়ে নাও!

দেবীর পূজা, দেবীর আরতি — এ সব তো আগেই ছিল, এবার রামকৃষ্ণ ধ্যানে বসতে শুরু করলেন। এ জন্য একটি প্রিয় জায়গাও তিনি বেছে নিলেন — পঞ্চবটী গাছের নিচে।

খনকার দিনে খুব অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হতো।
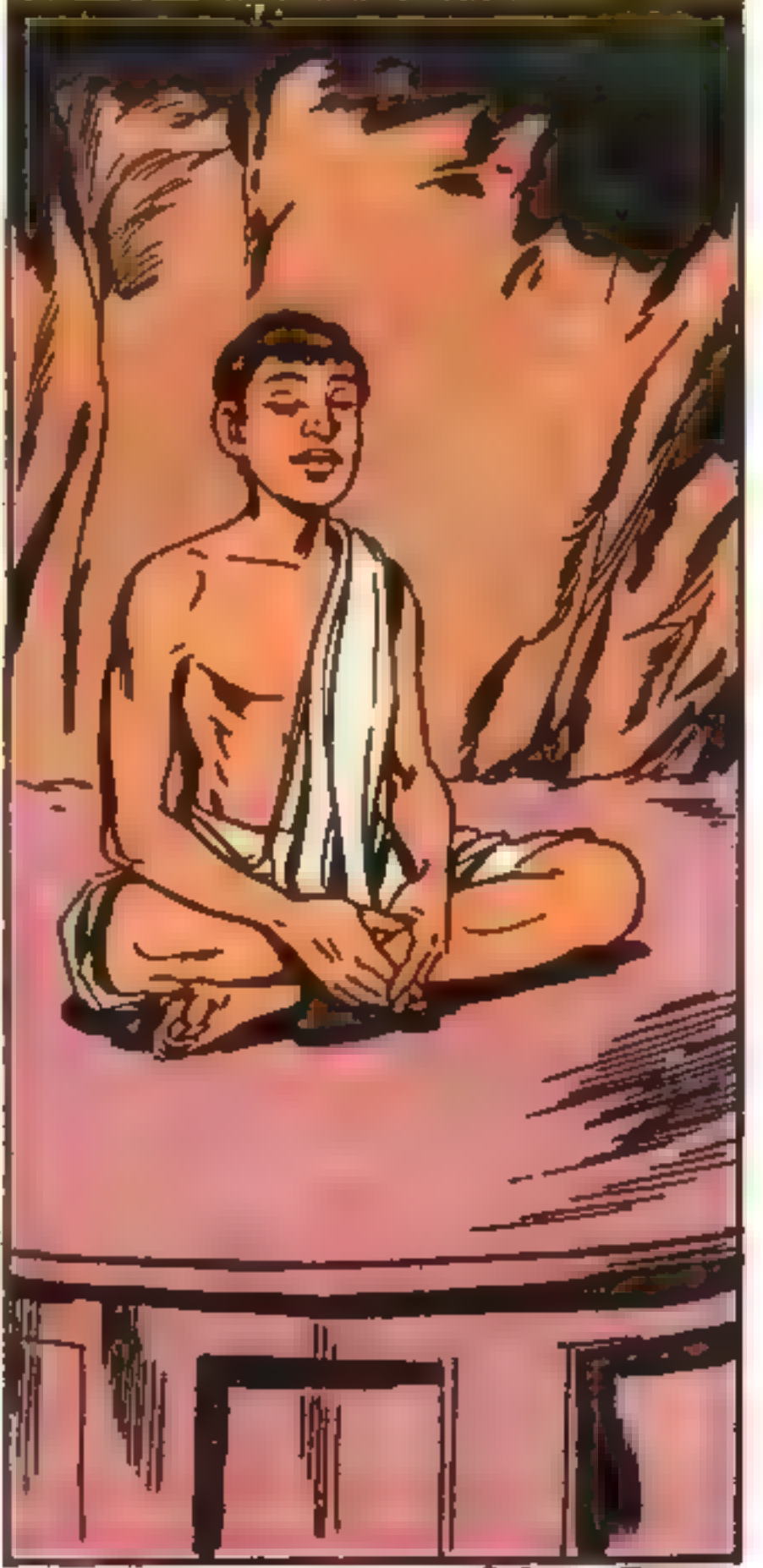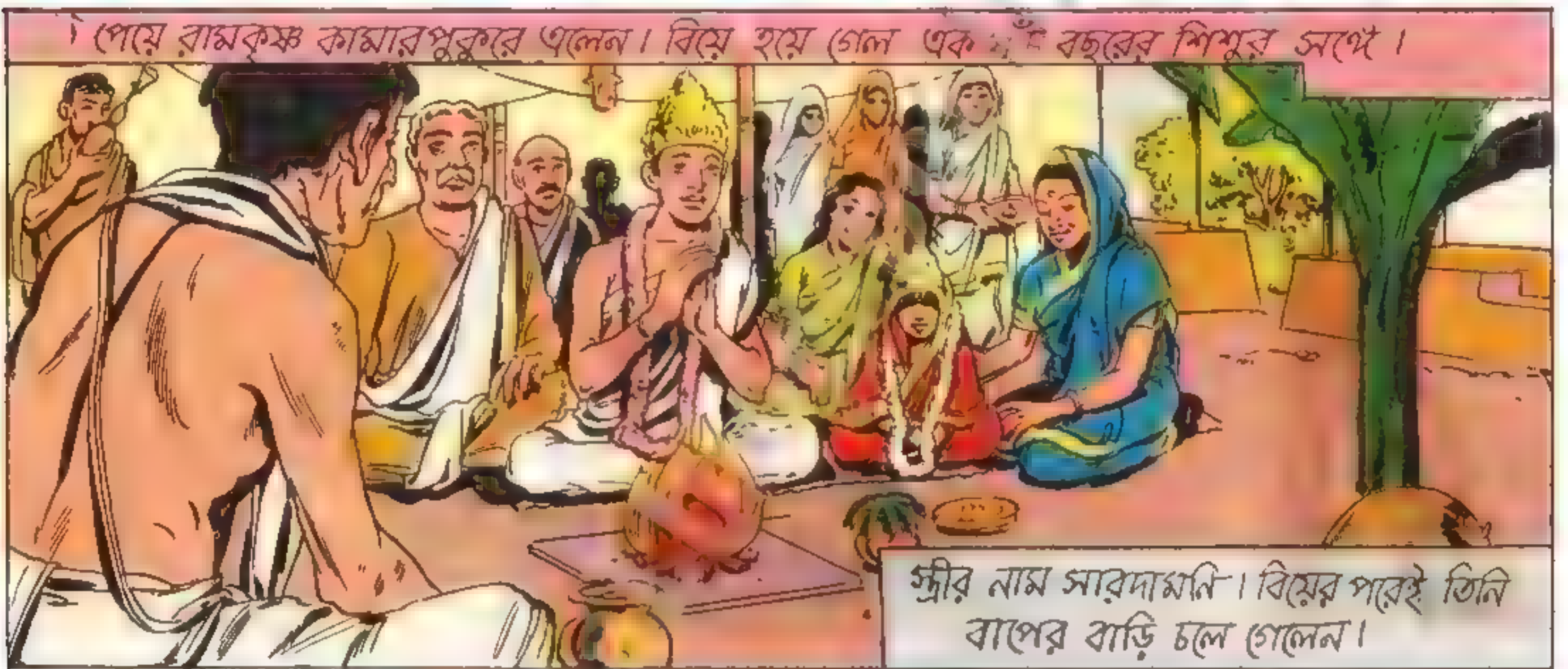
দক্ষিনেশ্বরেই রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক পাঠ নিতে শুরু করলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মনীর কাছ থেকে ধর্ম সম্পর্কে নানা তত্ত্বকথা তিনি শুনলেন...
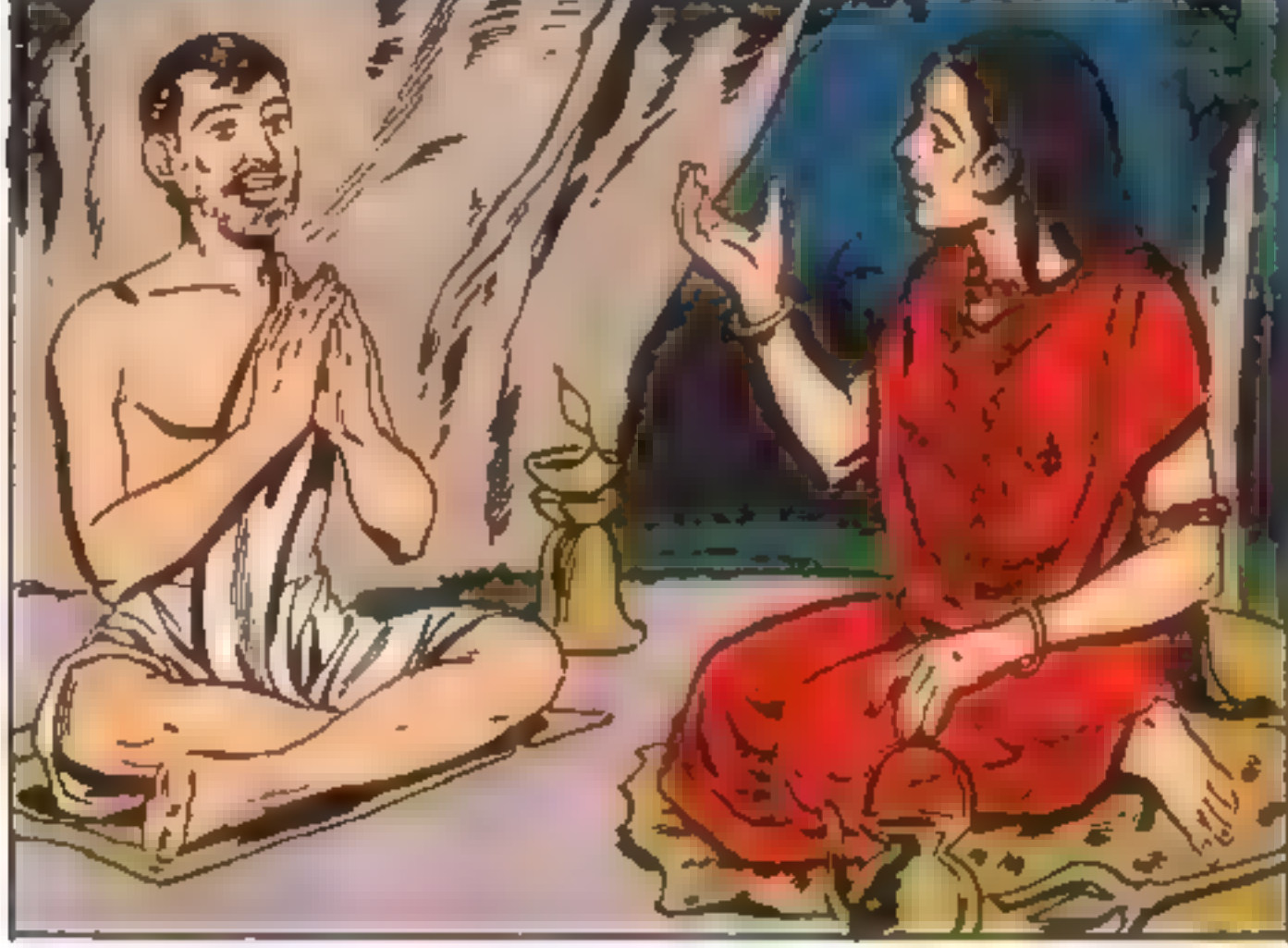
...তারপর এলেন তোতাপুরী, তিনি নানা জ্ঞানের কথা শোনালেন...
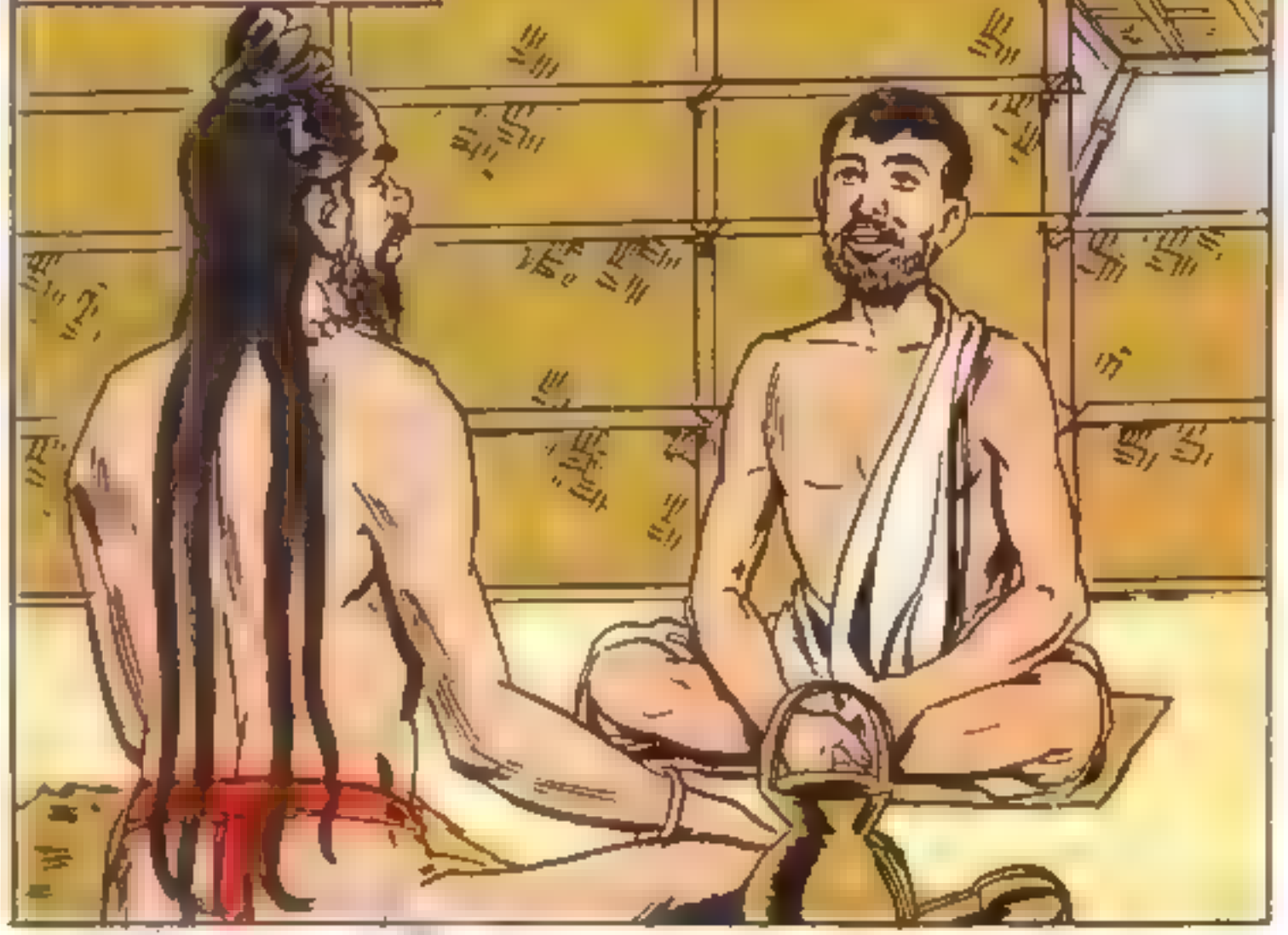
কিছুকাল এই ভাবেই গেল। এবার মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে পশ্চিমে নিয়ে গেলেন তীর্থদর্শনের জন্য। দেওঘরে পা দিতেই রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখলেন অন্য দৃশ্য, গ্রাম জুড়ে অনাহার।
মথুরবাবু, রানী মা আপনাকে অনেক টাকা-কড়ি দিয়েছেন। এঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করুন।
কিন্তু ঠাকুর, তীর্থ দর্শনের জন্যই অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এঁদের দুঃখ দূর করতে গেলে আমি ফকির হয়ে যাবো।
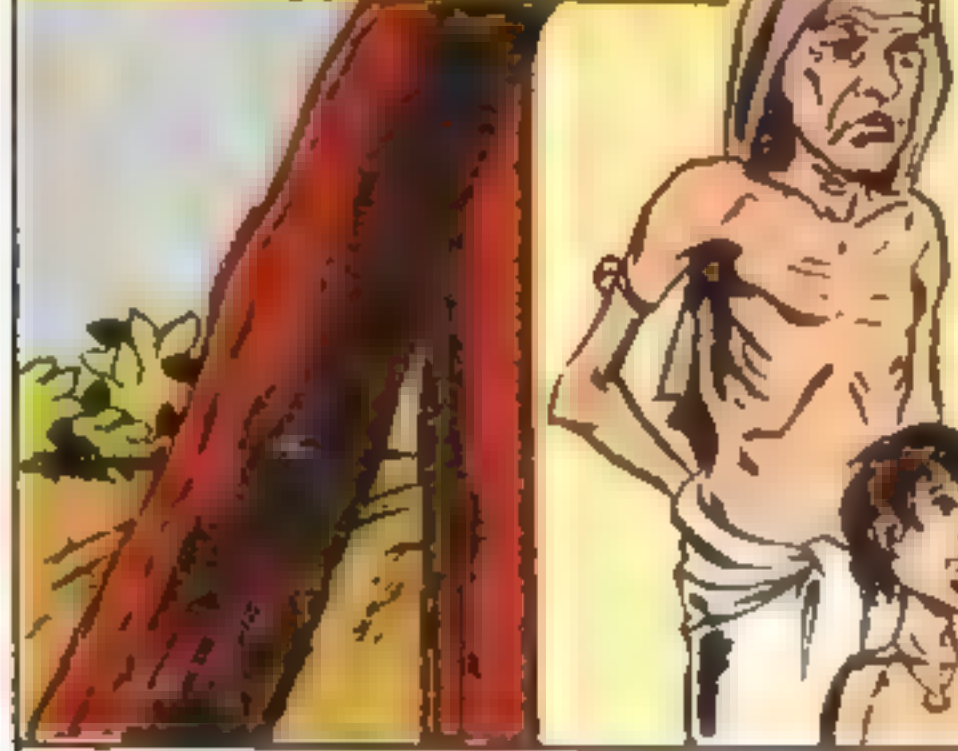
আপনার অনেক টাকা আছে। ওদের ব্যবস্থা না করলে, আমি আর এক পা-ও এগুবো না—এঁদের সঙ্গেই থেকে যাবো।
শান্ত হোন, আপনি যা বলবেন, তাই করবো।

দেওঘর থেকে তাঁরা কাশী গেলেন। সেখানে নানা মন্দির। যতো দেখেন ততোই আনন্দ আর বিস্ময়।
ভক্তদের প্রার্থনায় এখানকার বাতাস সব সময় পবিত্র হচ্ছে। এমনটি আর কোথাও দেখি নি।
তীর্থের পর তীর্থ দর্শন করে এক সময় তাঁরা দক্ষিনেশ্বরে ফিরে এলেন।

দিন যেতে লাগলো। একদিন সারদামণি সতেরো বছরে পা দিলেন। স্বামীকে নিয়ে তিনিও নানা গুজব শুনলেন।
সবাই বলছে, উনি পাগল। কিন্তু ওঁর পাগলামী তো ঈশ্বরকে জানবার জন্যই।

তিনি মনস্থির করে ফেললেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে—
সারদা—তুমি? তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে!
এখন থেকে আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো।

আপনাকে কী ভাবে দেখবো?
মা যেভাবে ছেলেকে দেখে। আমার অনেক মা—একজন এই মন্দিরেই আছেন; আর একজন, যিনি আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন। তুমিও তো ওঁদেরই একজন।

এর পর রামকৃষ্ণ এক কান্ড করলেন। স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করতে লাগলেন।

এতো দিনে রামকৃষ্ণ একজন জ্ঞানী ও গুণী মানুষ বলে চারদিকে পরিচিত হয়েছেন।
ঠাকুর! পৃথিবীতে নানা ধর্ম, নানা মত। সবাই কি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়?
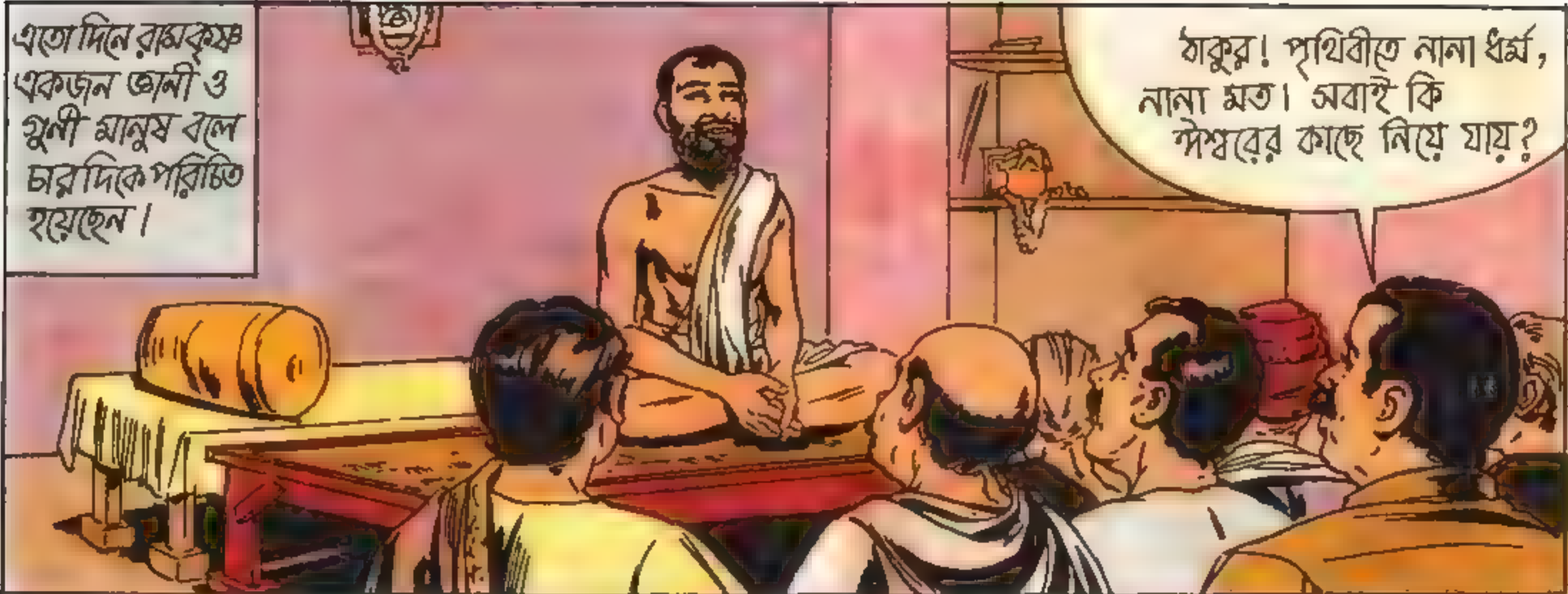
উত্তর খুঁজবার জন্য রামকৃষ্ণ অন্যান্য ধর্মকে বুঝবার চেষ্টা করলেন। কিছুদিন গেল—
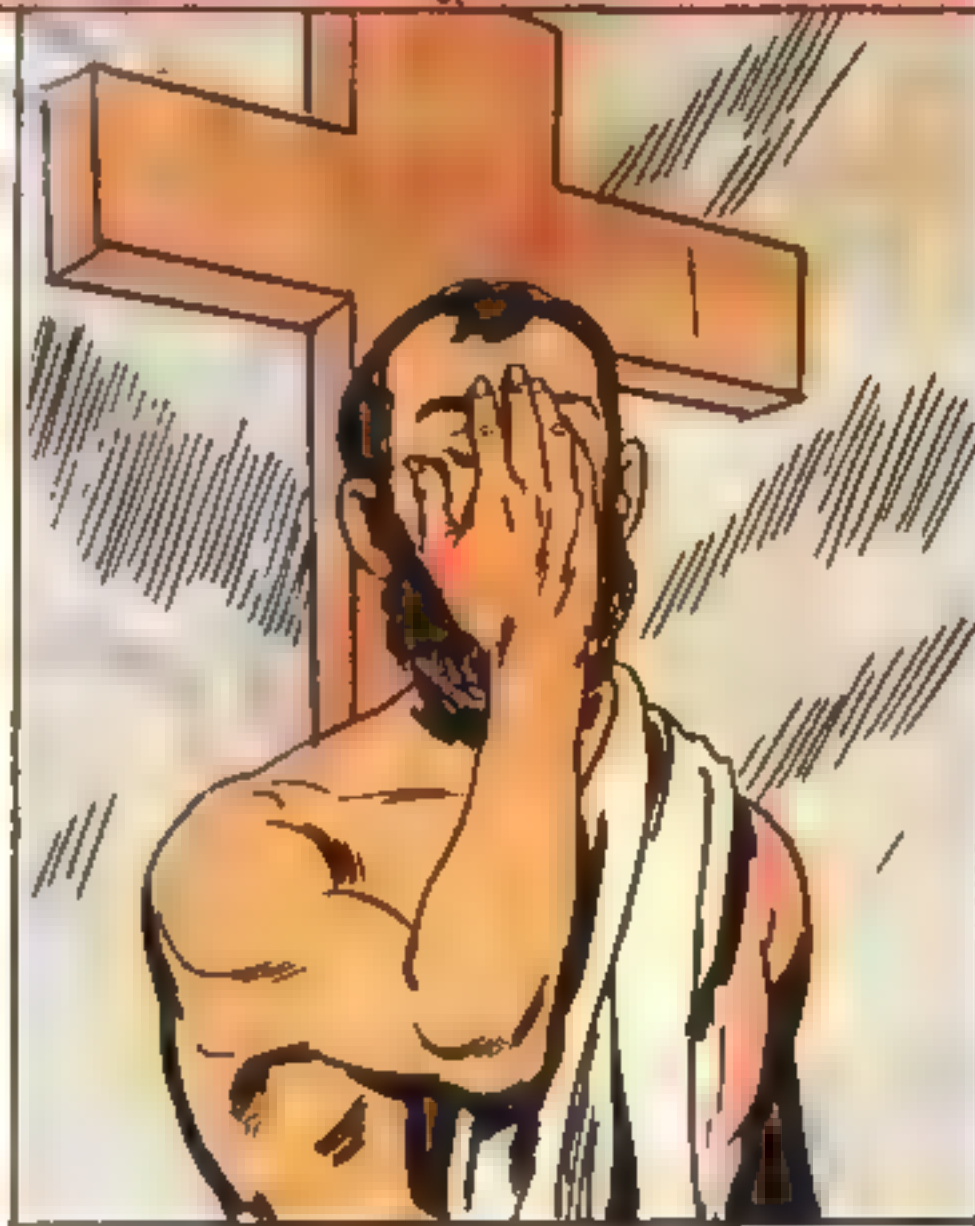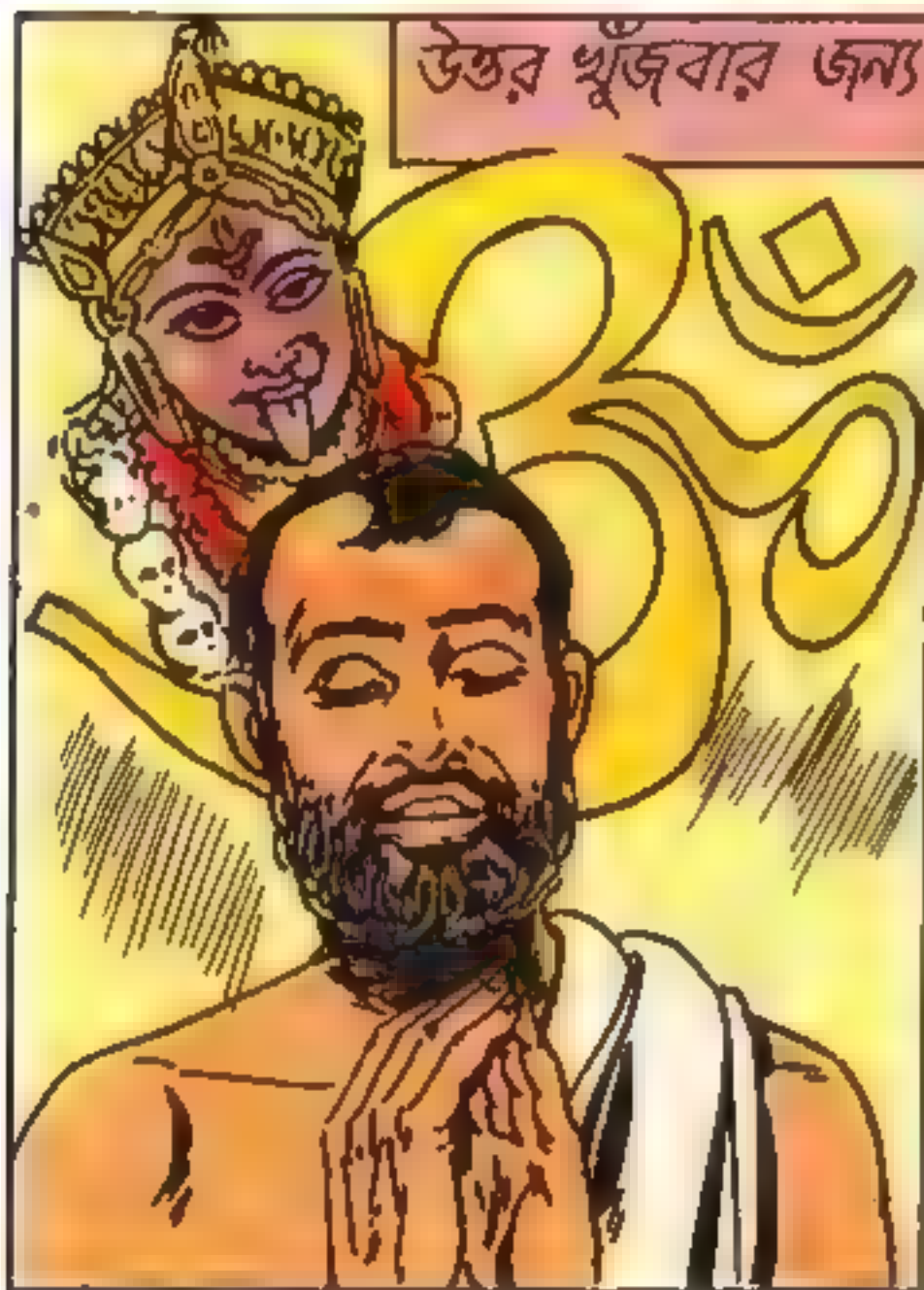
সব ধর্মই তো তাঁর কাছে নিয়ে যায়, তিনি সবার মধ্যেই আছেন।
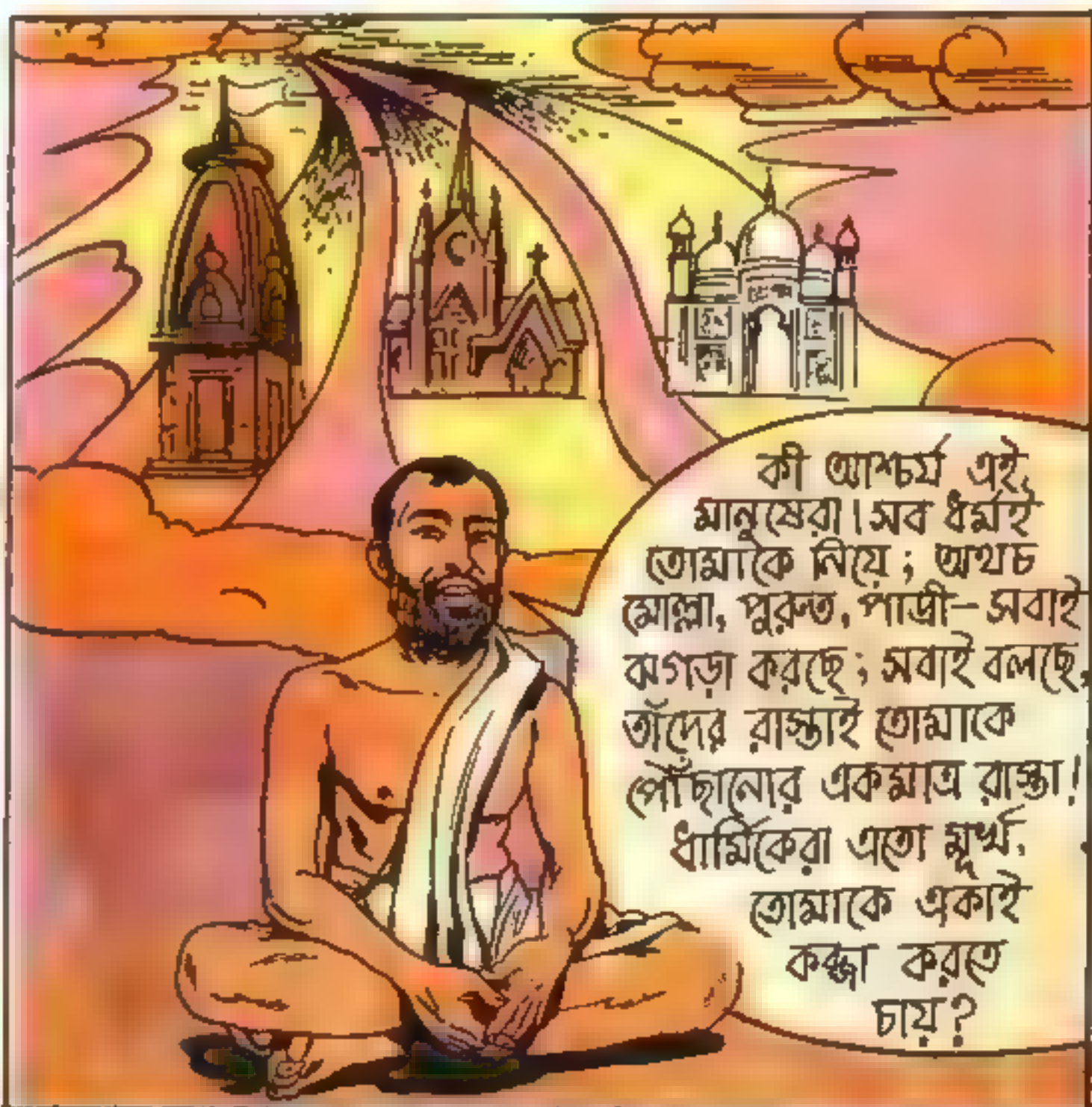
কী আশ্চর্য এই মানুষেরা। সব ধর্মই তোমাকে নিয়ে; অথচ মোল্লা, পুরুত, পাদ্রী— সবাই ঝগড়া করছে; সবাই বলছে, তাঁদের রাস্তাই তোমাকে পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তা! ধার্মিকেরা এতো মূর্খ, তোমাকে একাই কব্জা করতে চায়?

260 BENG.

যেহেতু তিনি সব ধর্মকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, নানা ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে আসতেন তাঁর মুখের কথা শুনতে।
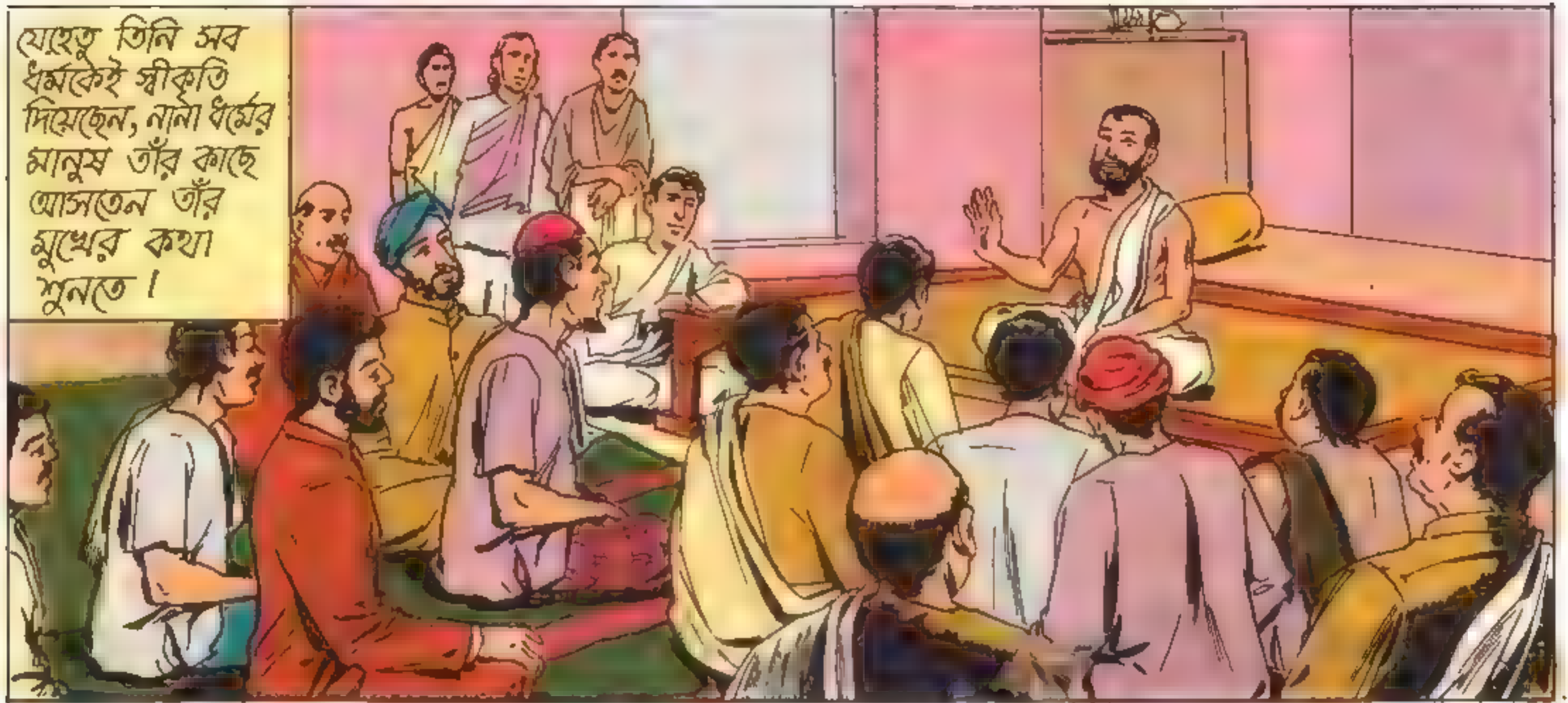
কিন্তু রামকৃষ্ণের মনে শান্তি নেই, অনেকেই তো আসছেন, তবু—
তুই না বলেছিলি আমার ছেলেদের আমার কাছে পাঠাবি? যাঁরা আসছেন, সবাই দূরের মানুষ; কাছের মানুষরা কেউ তো আসছেন না।

আমার বুকের মধ্যে অনেক কথা জমে আছে। সে সব কথা ওরাই তো বুঝবে, সবাইকে জানাবে।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। একে একে তাঁরা এলেন — রাখাল, লাটু, বাবুরাম, শরৎ, তারক ...
ওঁর ভিতরে কী আছে? না দেখলেই ছটফট করি?
ওঁর জন্য বাড়ি-ঘর, সুখ-সাচ্ছন্দ্য সব সব ত্যাগ করতে পারি।
ওঁর কাছে এলেই পৃথিবীর আর সব কিছুই মিথ্যে মনে হয়। কিন্তু কেন?
সত্যিই, এঁরা অনেক কিছু ত্যাগ করে এক দিন সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে মঠে যোগ দিয়েছিলেন।

এঁদেরই একজন, নরেন, একদিন সমস্ত পৃথিবীকে রামকৃষ্ণের নাম শুনিয়েছিলেন। প্রথম যখন গুরুর কাছে এলেন, তাঁর মনে তখন ছিল দ্বন্দ্ব।
লোকে বলে ইনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। কিন্তু আমার মন জানে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। তাহলে কী জন্যই বা এখানে আসা?

একদিন তিনি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলেন—
আপনি সত্যিই ঈশ্বরকে দেখেছেন? নিজের চোখে?
হ্যাঁ, যে ভাবে তোকে দেখছি। তুই তাঁকে সত্যিই দেখতে চাস?
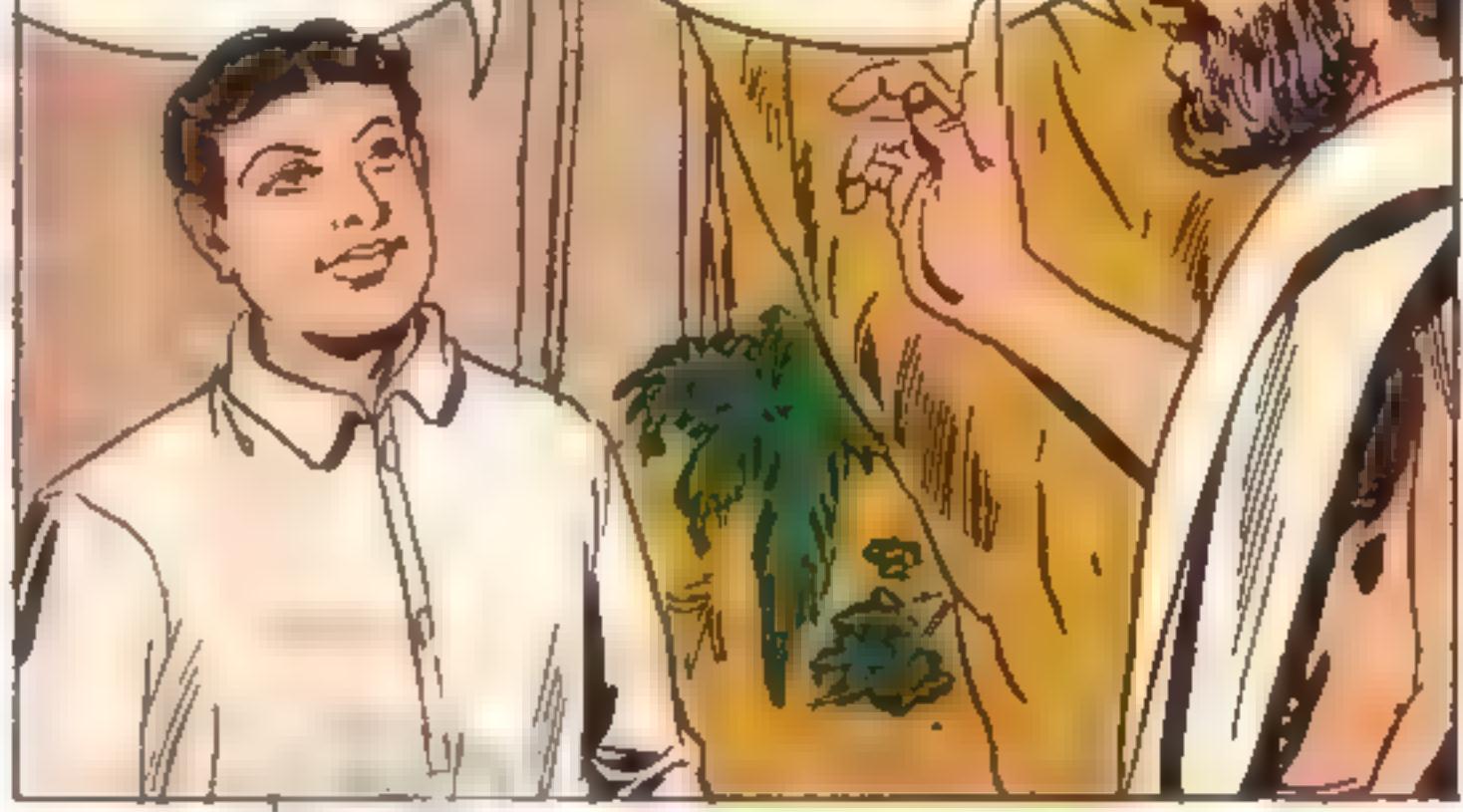
যেন এক অদৃশ্য চুম্বক, যা অন্য শিষ্যদের যখন তখন দক্ষিণেশ্বরে টেনে আনতো, নরেন্দ্রকেও আকর্ষণ করতে লাগলো।
অসময়ে কোথায় যাচ্ছিস?
দক্ষিণেশ্বরে।

পাগলটার কাছে? আবার? তোকে নিয়ে আমার এতো স্বপ্ন— আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবি, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবি! শোন্, ধর্ম নিয়ে এতো মাতামাতি করিস না!
হ্যাঁ... কিন্তু... আচ্ছা, ভেবে দেখি...
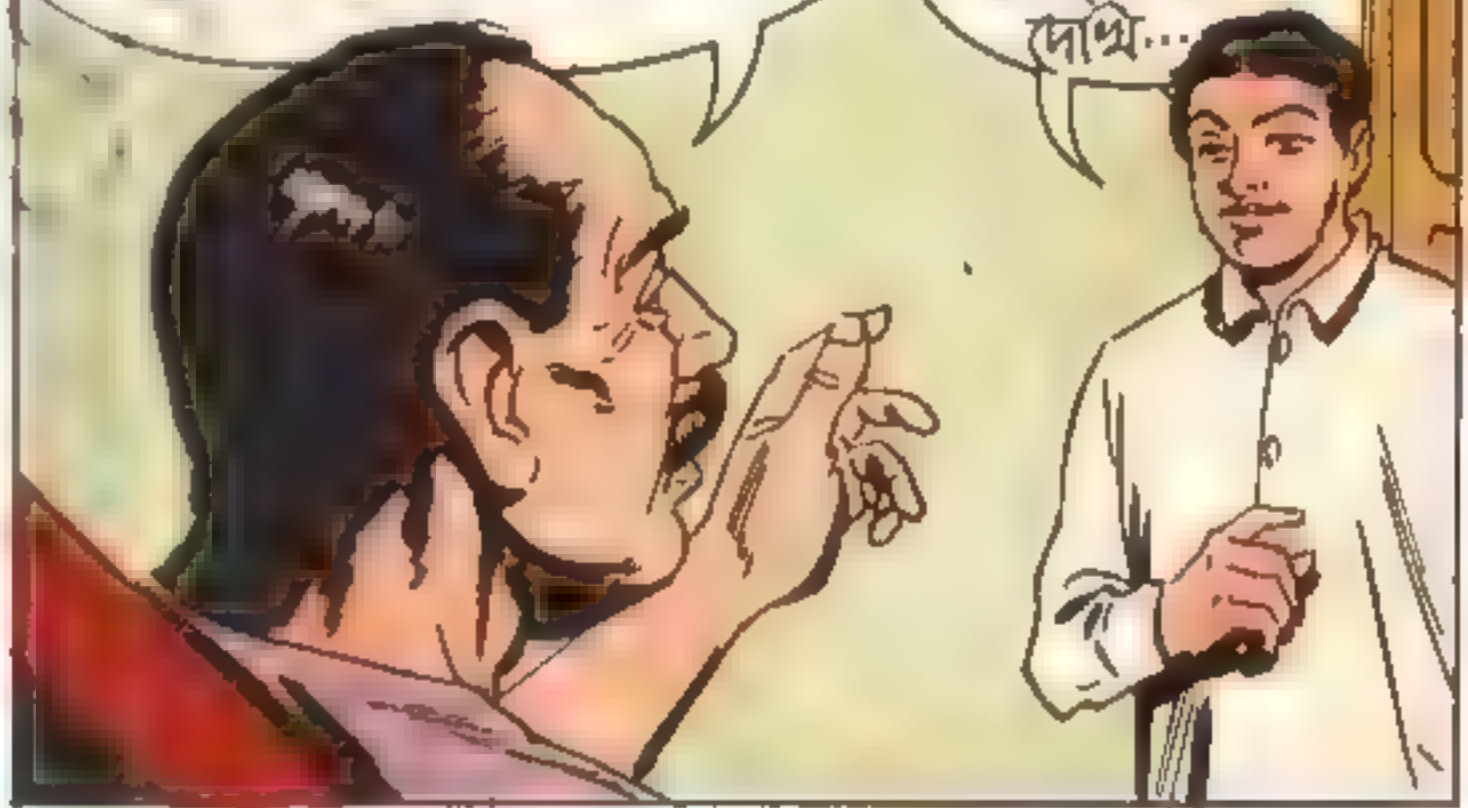
আমার ভিতরে দুটো মানুষ— একজন চায় অনেক টাকা পয়সা, বাড়ি, গাড়ি। আর একজন — ফকিরের মতো এই রাস্তায় ঐ রাস্তায় অন্য কিছুর সন্ধানে...

কোনটা সত্যিকারের আমি?

শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর জীবনকেই তিনি বেছে নিলেন, রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব বরণ করলেন। নিজের স্বাধীন চিন্তাকে কিন্তু তিনি কোনও দিনই বিসর্জন দেন নি।
ঠাকুর, আপনার অনেক কথাই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হয়।
বুঝলাম, এখনও তোর পরীক্ষা করার স্বভাবটা বদলায় নি।

আপনি বলেন ঈশ্বর নিরাকার। আবার একটা পাথরের মূর্তিকে আপনি পূজা করেন। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?
ভগবান তো সব খানেই রয়েছেন। যদি কেউ একটা মূর্তিকে সামনে রেখে তাঁকেই মনে প্রাণে ডাকে, তিনি সেই ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন।

আর তুই তাঁকে সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইছিস কেন? মায়ের অনেক ছেলে, কেউ এটা খেতে চায়, কেউ ওটা খেতে চায়। সে ভাবেই মা তাদের জন্য থালা সাজিয়ে দেন - যার যেমন পছন্দ। ঈশ্বর আর ভক্তের সম্পর্কটাও তাই - যার যে ভাবে পছন্দ, সেভাবেই তাকে পায়।

শিষ্যদের সঙ্গে গুরুর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। তাঁদের সঙ্গে তিনি হাসি ঠাট্টা করতেন, তাঁদের খেলায় পর্যন্ত যোগ দিতেন; আবার সুযোগ মতো উপদেশও দিতেন।
ভক্তিতে অবিচল থাকা চাই। লঙ্কায় পৌঁছাতে রামকে সেতুবন্ধন করতে হয়েছিল...

কিন্তু হনুমান ভক্তির জোরে লাফিয়ে ঐ সমুদ্র পার হয়েছিলেন।
হো! হো! হো!

শিষ্যরাও গুরুকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। একদিন তাঁদেরই একজন, নিরঞ্জন, নৌকো করে গঙ্গা পার হচ্ছিলেন —
দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ দেখেছিস? আর একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী, যার পিছনে ফেউয়ের মতো ভক্তেরা ছুটছে!
খায় কী, যেন একটা কুস্তিগীর। পেটের জন্যই ঈশ্বর — হাঃ! হাঃ!!
এ দিকে তাকান…

…এ সব কী বলছেন! আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি জানি। তিনি সত্যিকারের সাধু, একজন খাঁটি মানুষ।
উনি হলেন আদর্শ শিষ্য, — গুরুনিন্দা সহ্য হয় না!
আপনি একজন যুবক — পাগলের কথায় নাচেন?

মুখ সামলে কথা বলুন, নইলে এখনই নৌকো ডুবিয়ে দেবো।
ও কী হচ্ছে! মাথা খারাপ করছেন কেন?
ঠিক আছে ভাই, আপনি শান্ত হোন!

ভক্ত যখন গুরুকে সেদিনকার ঘটনা সবিস্তারে জানালেন —
এ ভাবে মাথা গরম করলি কেন? কে কি বলেছে, তাতে আমাদের কি সত্যিই কিছু আসে-যায়? কখনও লোকের কথায় কান দিবি না।

আর একদিনের ঘটনা। শিষ্যদের মধ্যে যোগীন ছিলেন একটু গোবেচারা ধরনের। পাড়ার লোকেরা গুরুর নিন্দা করছেন – শুনলেন, কিন্তু চুপ করে রইলেন।
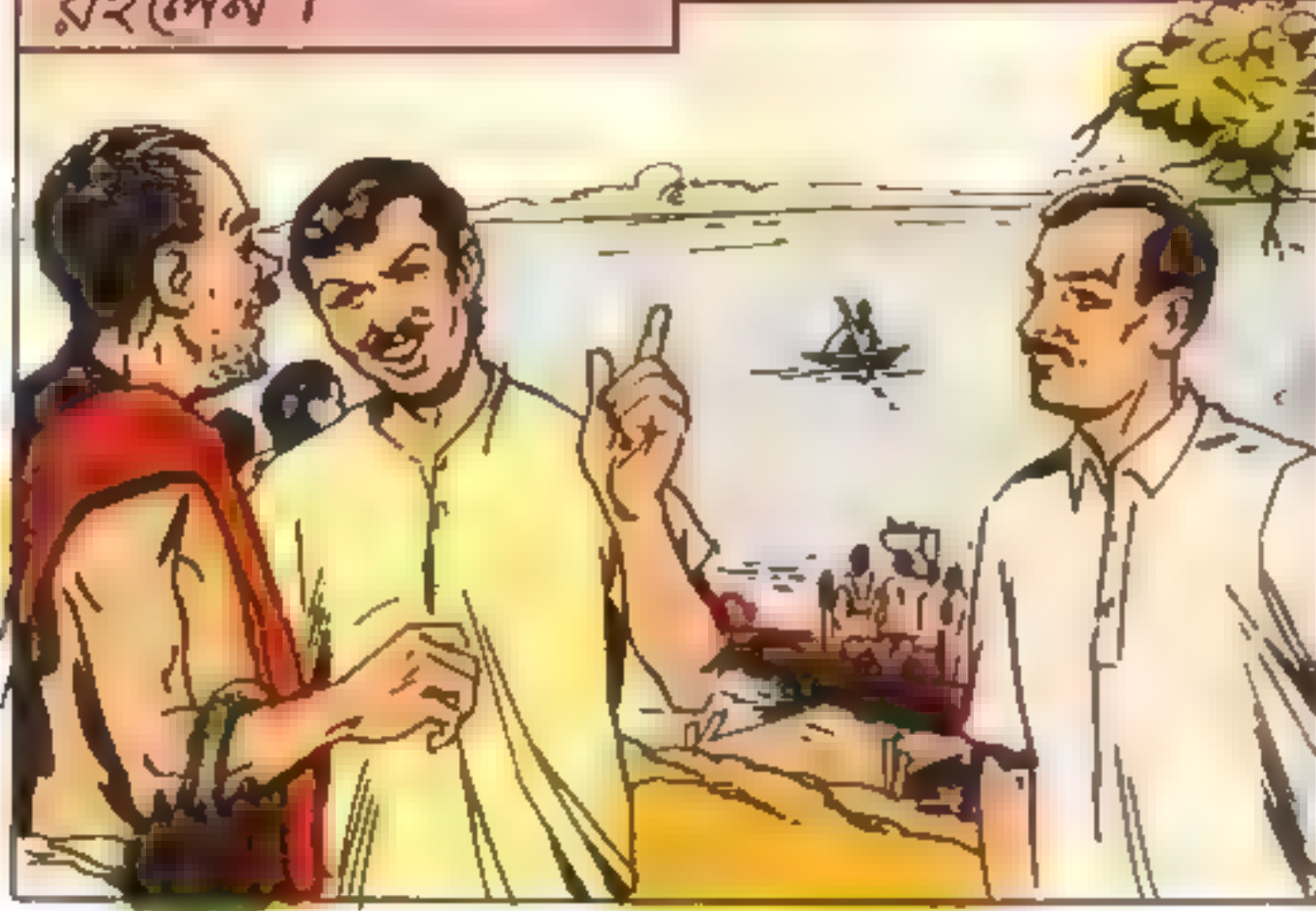
রামকৃষ্ণ যখন ঘটনাটি জানলেন —
কী রে? লোকে আমার নিন্দা করলো, তুই চুপচাপ সহ্য করলি! এই কী তোর গুরু ভক্তি?

সব শুনে নিরঞ্জন অবাক হয়ে গেলেন – এটা কী রকম হলো?
আমি প্রতিবাদ করলাম, উনি চটে গেলেন ; যোগীন চুপচাপ সহ্য করলো, এবারও উনি চটলেন!
বুঝতে পারছিস না? উনি আমাদের শোধরাচ্ছেন!

তুই মাথা গরম করেছিলি, উনি তোকে বললেন, শান্ত হতে! যোগীন 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' হতে চেয়েছে, তিনি ঐ অতি-ভালোমানুষীর নিন্দা করলেন।
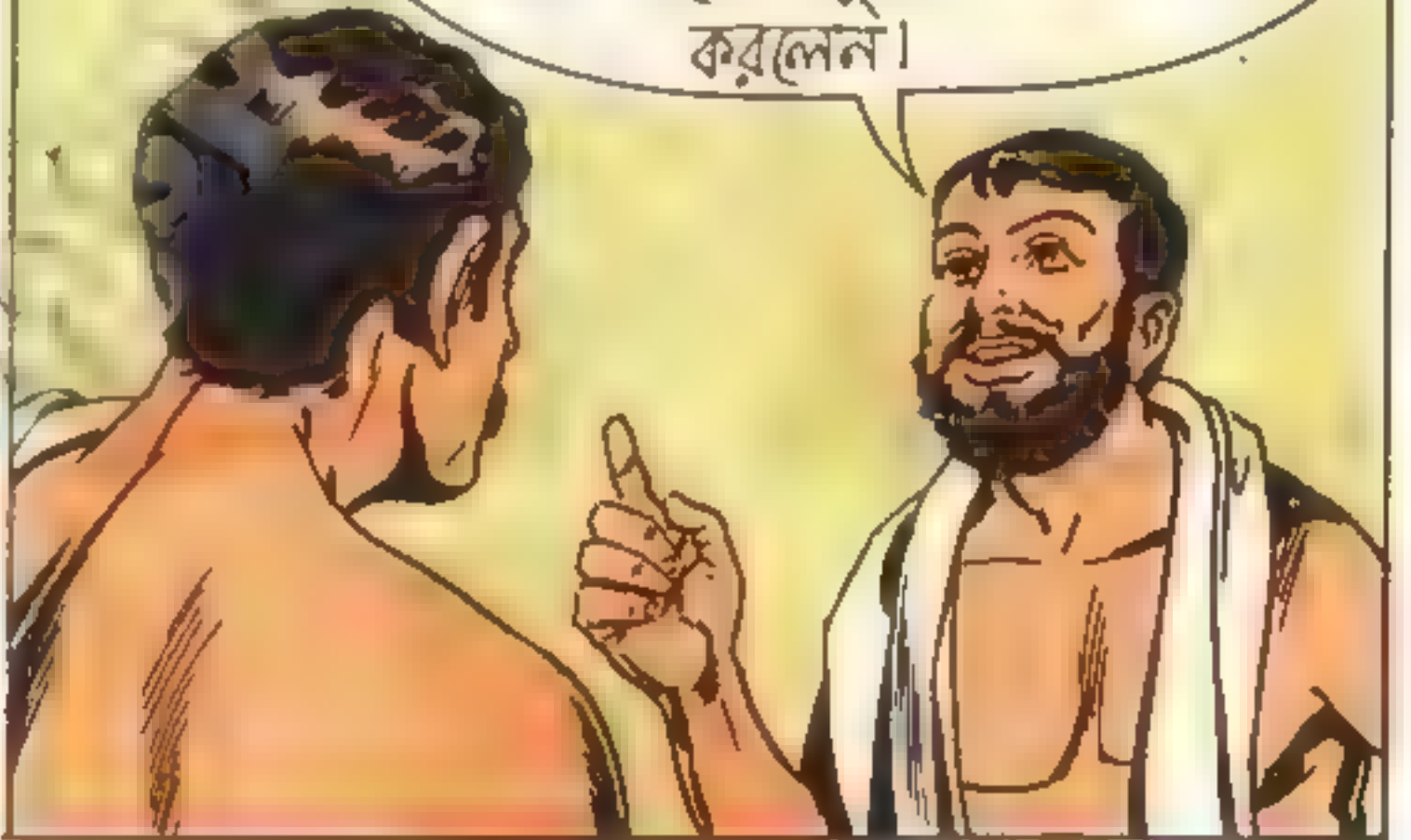
ক্রমেই রামকৃষ্ণকে ঘিরে সুধীদের ভিড় জমতে লাগলো। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা কেশবচন্দ্র সেন মাঝে মধ্যেই তাঁর কাছে আসতেন তাঁর কথকতা শুনতে। বাংলার বাইরে, যখন যেখানে যেতেন, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের গুন-কীর্তন করতেন।
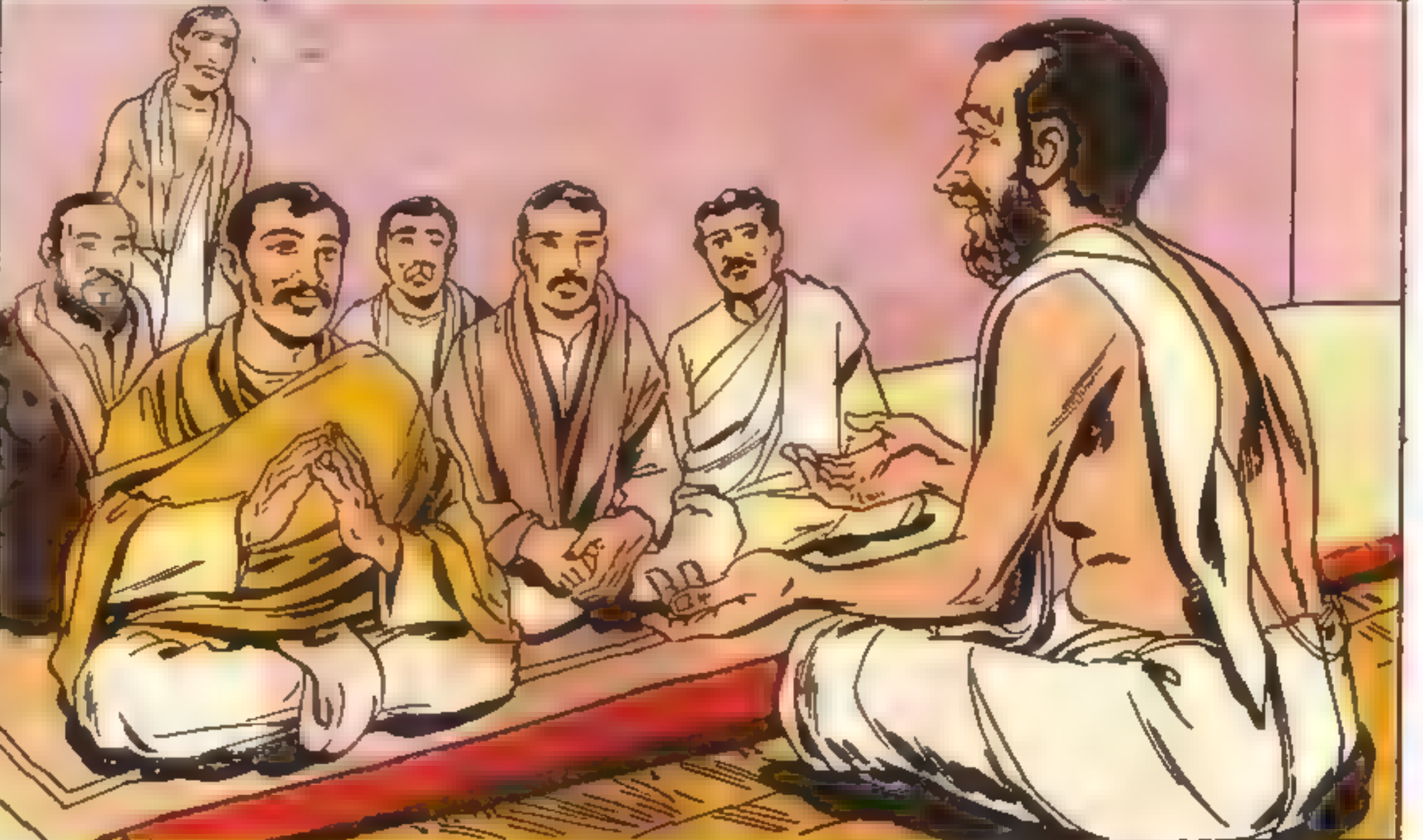
শ্রোতারা সবাই রামকৃষ্ণের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন।
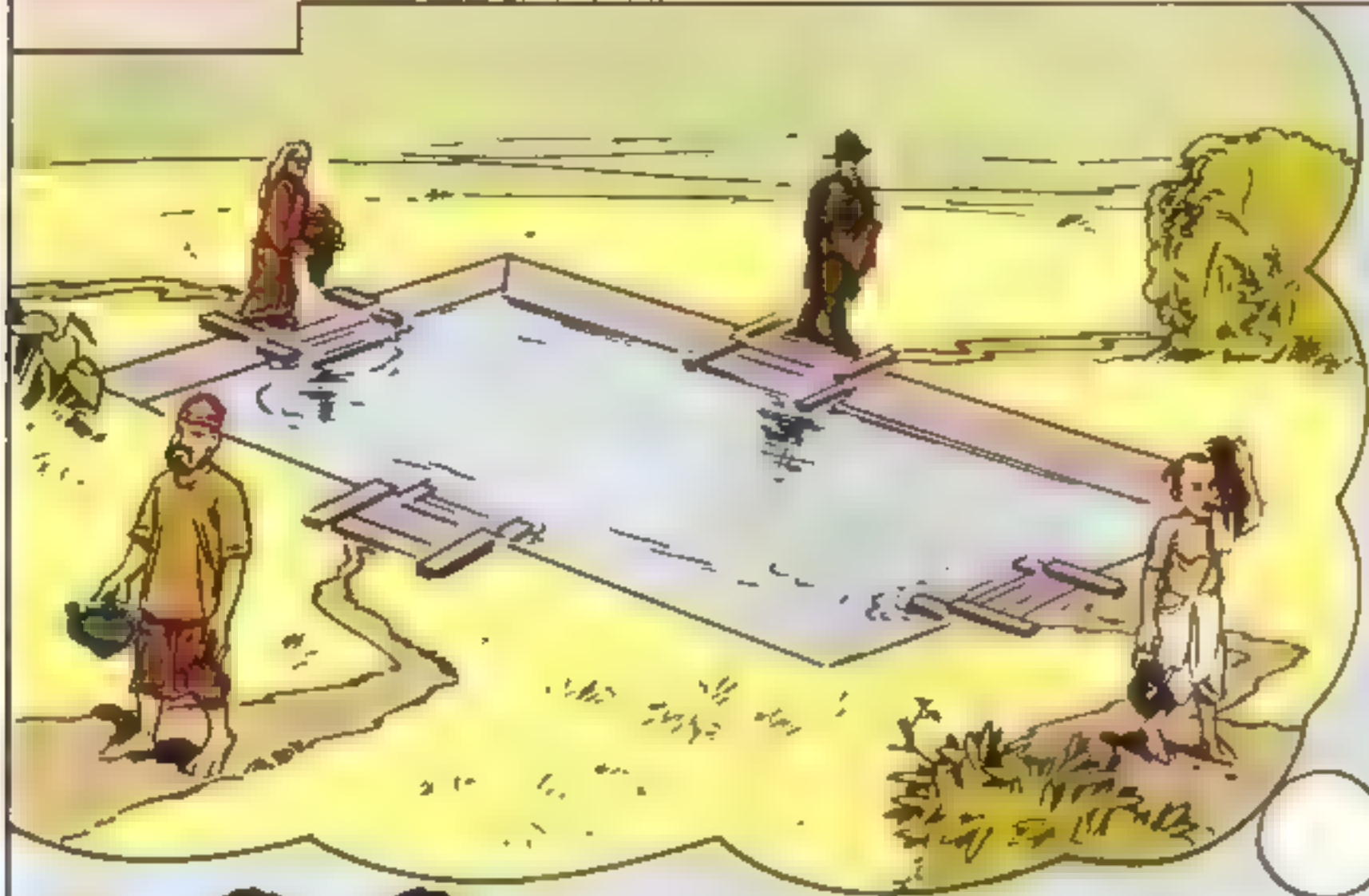
একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাট থেকে হিন্দুরা 'জল' তুলছেন আর এক ঘাট থেকে মুসলমানরা 'পানি'। ওদিকের ঘাট থেকে একজন খৃষ্টান নিয়ে যাচ্ছেন 'ওয়াটার'। যিনি যে নামেই ডাকুন, জলের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না— তা একই থেকে যাচ্ছে!

ভক্ত এবং অনুরাগীরা সবাই এগিয়ে এলেন, যাতে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি না হয়।
দরকার হলে বাড়ি বন্ধক রাখবো।
ঘরে যা সোনা দানা আছে, সব আনবো।
বাড়ি ভাড়ার টাকাটা আমি দেবো।
রুগীর ওষুধ পথ্য যা লাগবে, আমি দেবো।

ডা: সরকার প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু—
ওঁর ঈশ্বরের কোনও মূল্য আমার কাছে নেই, কিন্তু এতো লোক ওঁর জন্য সব কিছু দিতে চাইছে— এটাও আশ্চর্যের!
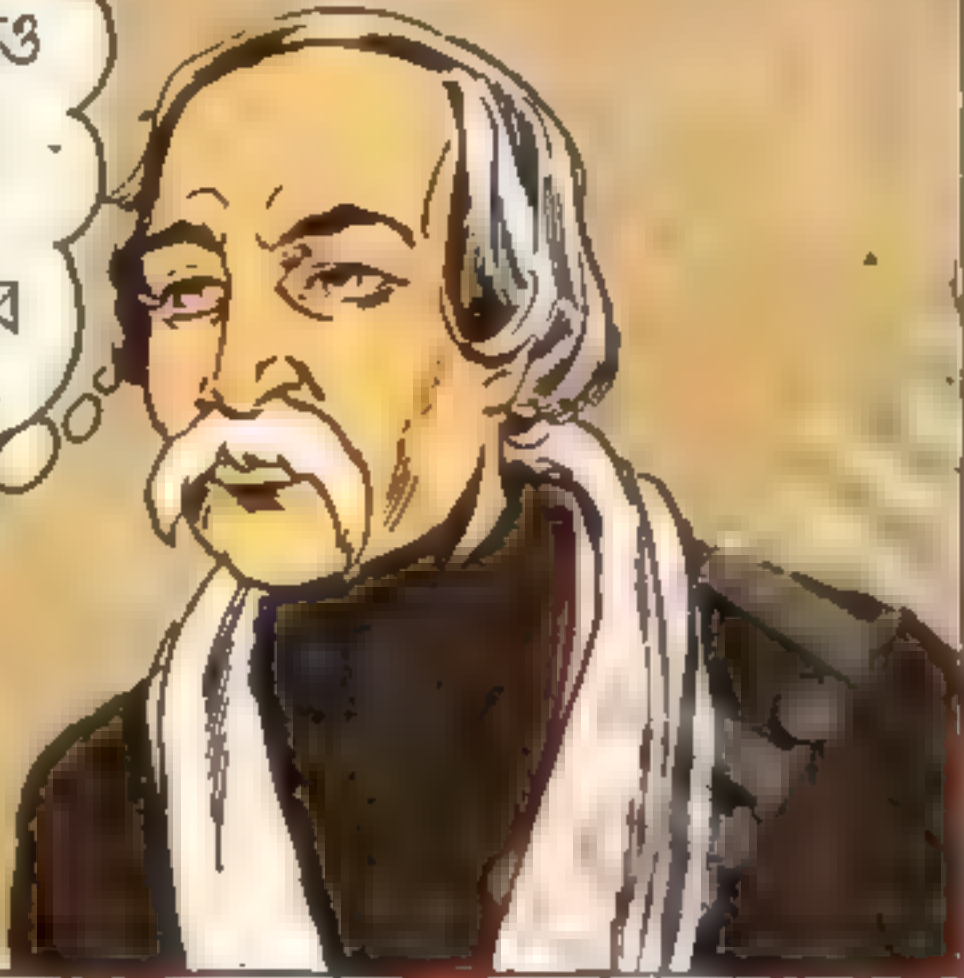
পরে—
ডাক্তারবাবু, আপনার 'ফি'...
ওটা রেখে দিন। আমি টাকা ছাড়াই ওঁকে দেখবো।

রামকৃষ্ণকে তিনি কথা বলতে নিষেধ করলেন।
ওঁদের আসতে দে, নরেন। অনেক দূর থেকে ওঁরা এসেছেন আমার কথা শুনতে।

এক দিন নরেনকে কাছে পেয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। যেন একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শের অনুভব—পরে নরেনের তাই মনে হয়েছিল।
আমার যা আছে সব তোকে দিলাম। ভবিষ্যতে তুই অনেক বড় কাজ করবি।

কিছুদিন পরে, আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে—
যোগীন, মাসের তারিখগুলি একে একে বলে যা!
বলছি, শুনুন!

যোগীন শুরু করলেন—
...বারোই আগস্ট, তেরোই আগস্ট, চোদ্দই ...

... আগস্ট, পনেরোই ...
ঠাকুর তাঁকে ইঙ্গিতে থামতে বললেন।

১৮৮৬ সালের পনেরোই আগস্ট সারদা দেবী এবং শিষ্যেরা তাঁকে ঘিরে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন—
নরেন ... নরেন ... ছেলেগুলিকে দেখিস ... ছেলেগুলিকে দেখিস ... ছেলেগুলিকে ...

তারপর রামকৃষ্ণের গলা থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দই শুধু বেরতে লাগলো। খুব অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো—
কালী! কালী! কালী!

এর পর তিনি একটা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো, আবার জেগে উঠবেন, কিন্তু—
রামকৃষ্ণের নিজের কথায় বলা যায়, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে তিনি চলে গেলেন।

New Tinkle – every child's favourite magazine, now *more* fun than ever before. Four more pages of delightful stories and entertainment – making 36 in all including the cover. Isn't that something really nice to look forward to?

Children – get ready for your 'new look' Tinkle. From **5th March 1983** – just Rs. 3/– per copy.

TINKLE

THE CHILDREN'S MAGAZINE FROM THE HOUSE OF AMAR CHITRA KATHA

Contour Ads-IBH-817/82

A BED TIME STORY
GRANDMA, TELL ME A STORY.
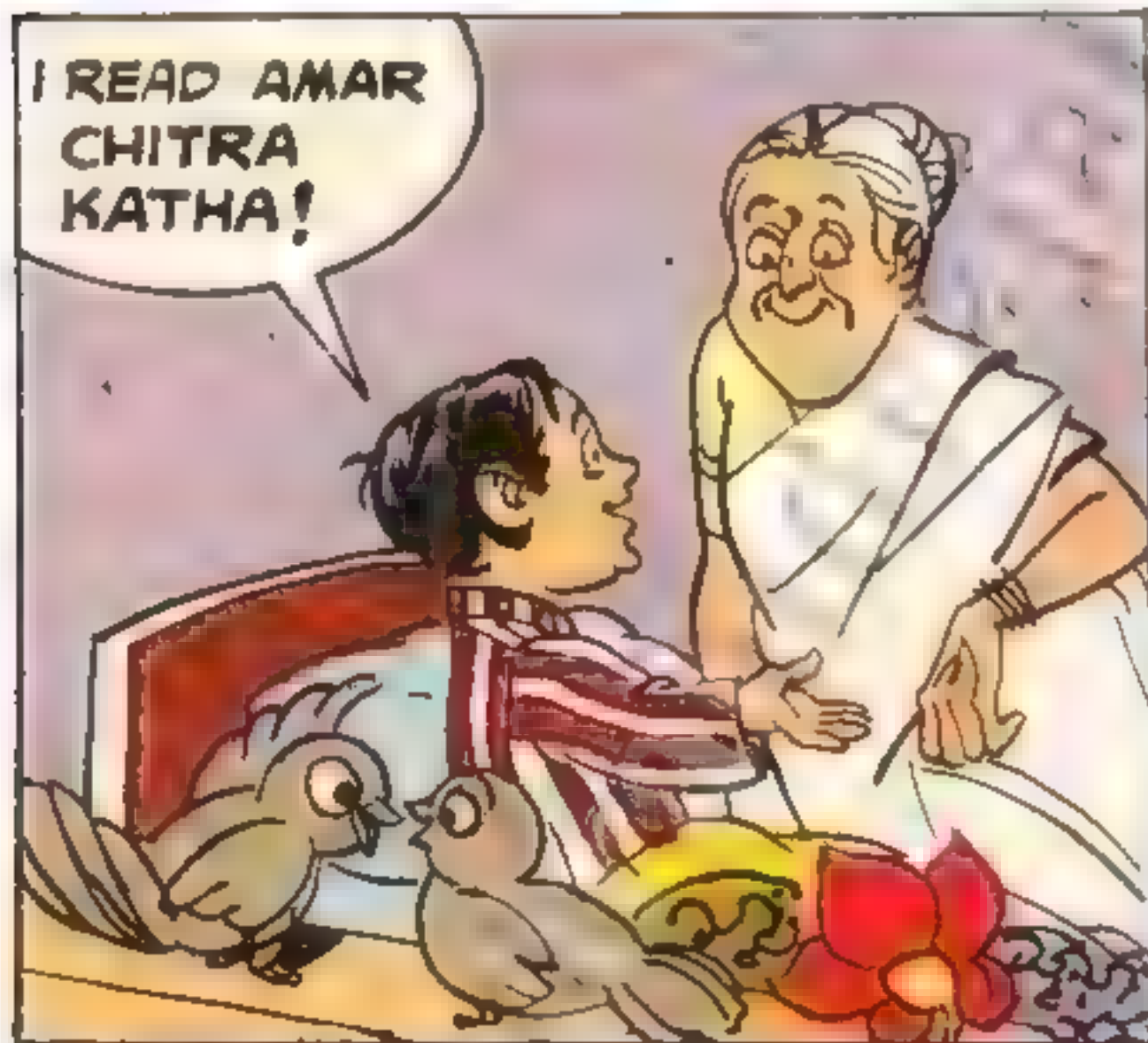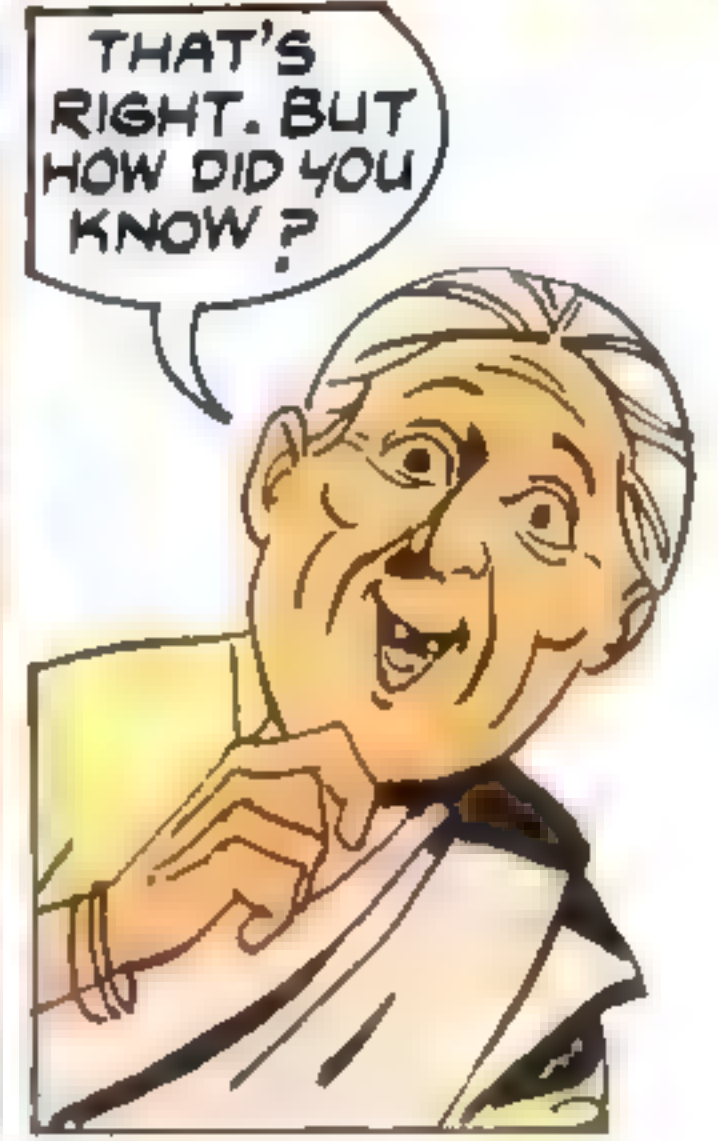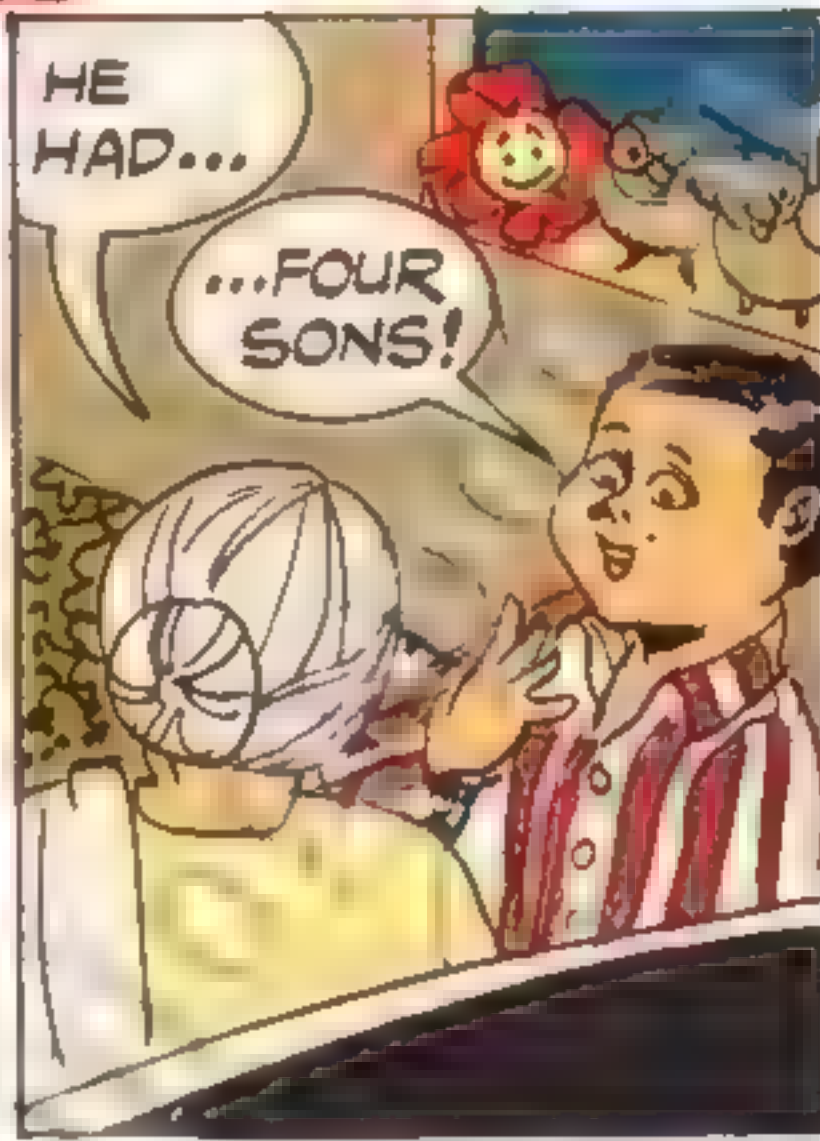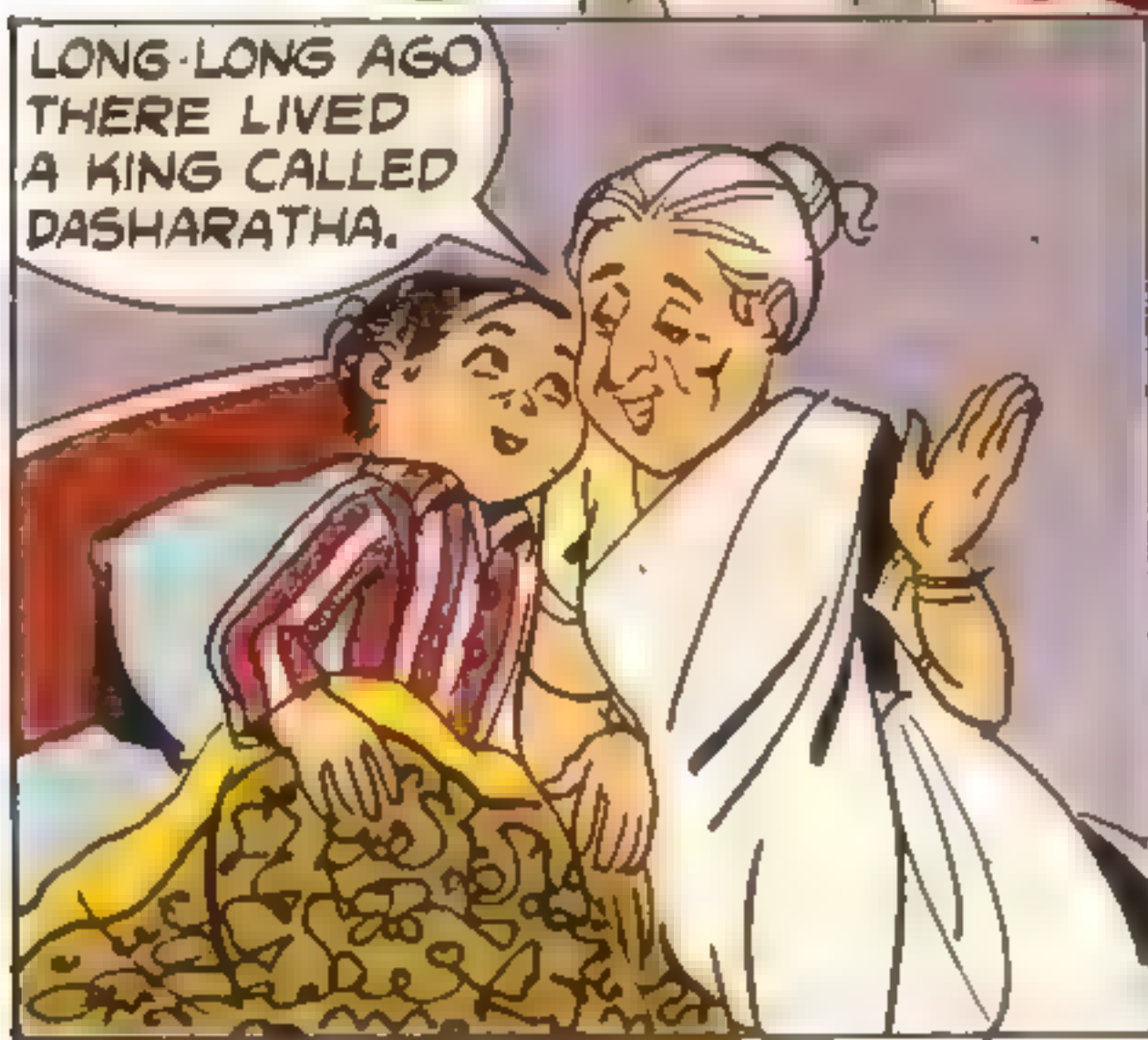
ALL RIGHT.

LONG-LONG AGO THERE LIVED A KING CALLED DASHARATHA.

HE HAD...
...FOUR SONS!

THAT'S RIGHT. BUT HOW DID YOU KNOW?

I READ AMAR CHITRA KATHA!

জ্ঞানী পণ্ডিত

একদিন কিছু লোক নৌকোতে নদী পার হচ্ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে এক পণ্ডিত ছিলেন।
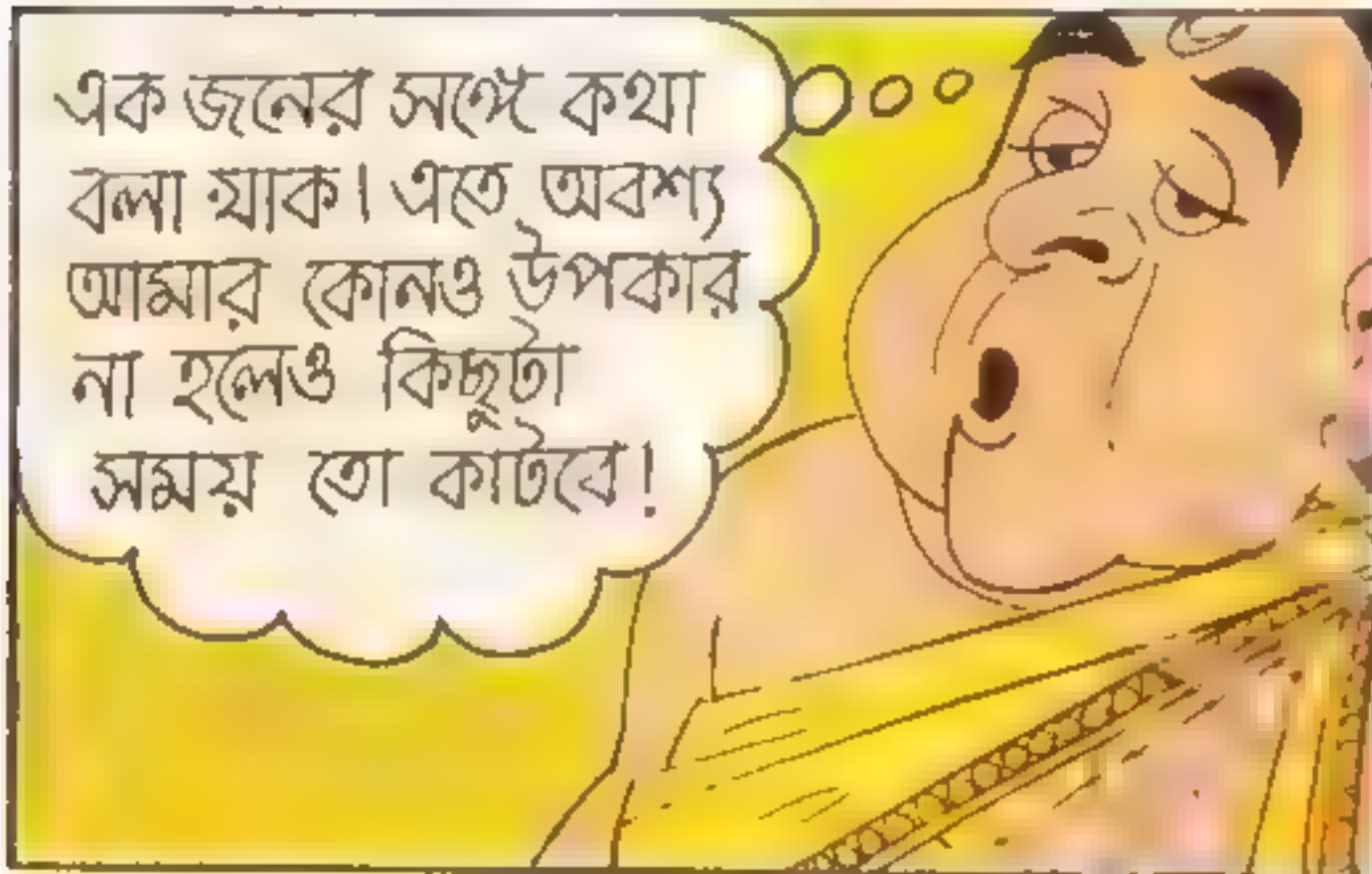
এক জনের সঙ্গে কথা বলা যাক। এতে অবশ্য আমার কোনও উপকার না হলেও কিছুটা সময় তো কাটবে!

আপনার পরিচয়? কোথা থেকে আসছেন?

আমি একজন চাষী। নদীর ওপারের গ্রাম থেকে আসছি।

আমি একজন পন্ডিত। উপনিষদের উপর আমার গভীর পড়াশোনা। আপনি উপনিষদ্ পড়েছেন?

আজ্ঞে, না!

পড়েন নি? হায়, হায়! তাহলে তো আপনার জীবনের এক চতুর্থাংশই বৃথা!

ভালো, তাহলে শাস্ত্রচর্চা নিশ্চয় করেছেন?
আজ্ঞে, না!

তাহলে আপনার জীবনের অর্ধেকই তো বৃথা। আচ্ছা, দর্শনের ষট্‌-ধারা কি কি?
আজ্ঞে, আমি এসবের নাম পর্যন্ত শুনি নি!

নাম পর্যন্ত শোনেন নি? তাহলে তো আপনার জীবনের তিন ভাগ সময়ই ... আরে!

নৌকোটা যে কেমন...

ঝড় উঠেছে! নৌকো সামলানো যাচ্ছে না! উল্টে গেল বোধহয়...আপনারা ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তীরে উঠুন!

ধার্মিক সাজা

এক অন্ধকার রাতে এক জেলে চুপি চুপি এক বাগান বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

চারপাশ নির্জন এবং অন্ধকার। মনে হয় সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে!

এবার নিশ্চিন্তে পুকুরে জাল ফেলে...

...মনের সুখে মাছ ধরা যাক!
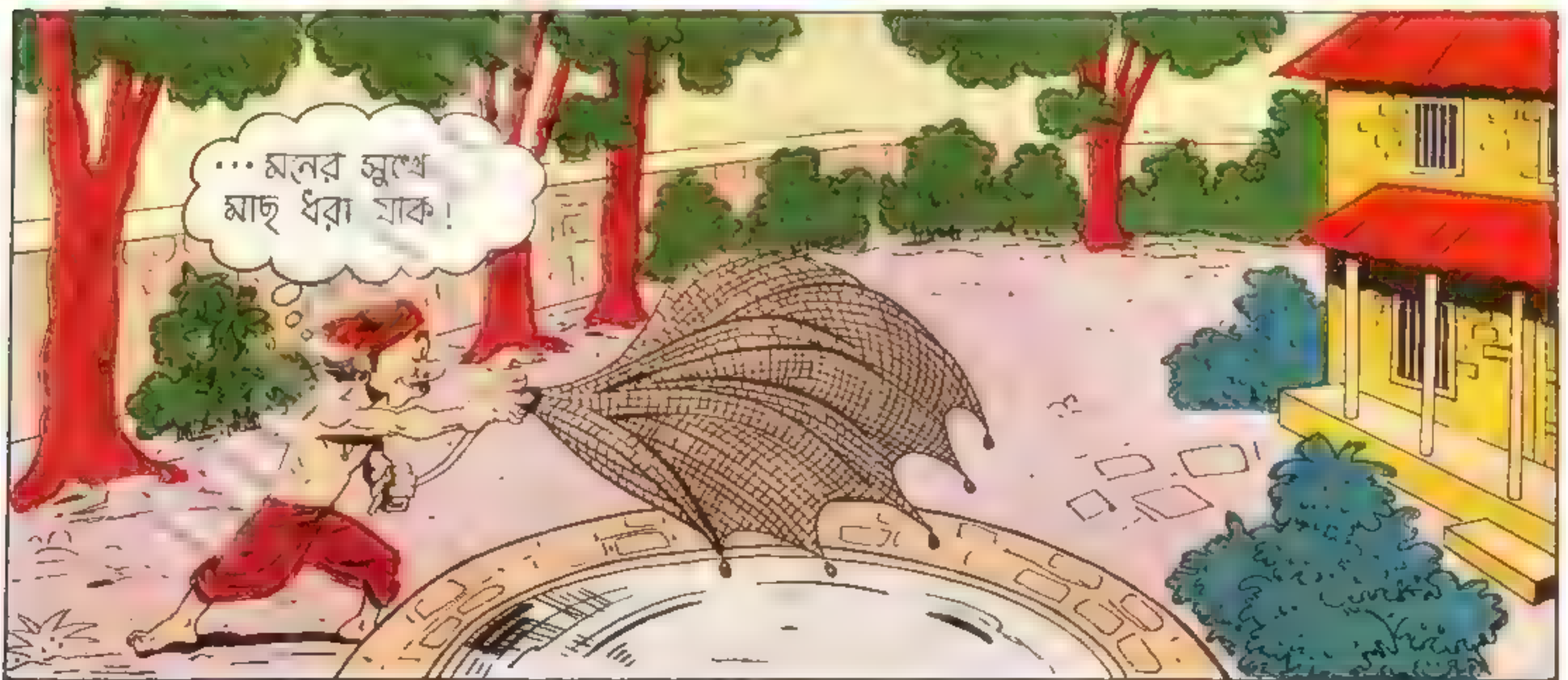
জলে জাল ফেলার শব্দ হলে —
কেমন যেন একটা শব্দ হলো? শুনতে পেয়েছো?
হ্যাঁ। মনে হলো, কেউ যেন পুকুরে জাল ফেলেছে!

জাল? পুকুরে? তাহলে কেউ মাছ চুরি করতে এসেছে! চোর! চোর!

গৃহকর্তা পরিচারকদের জাগিয়ে তুললেন
জলদি! চোর! পাকড়াও!
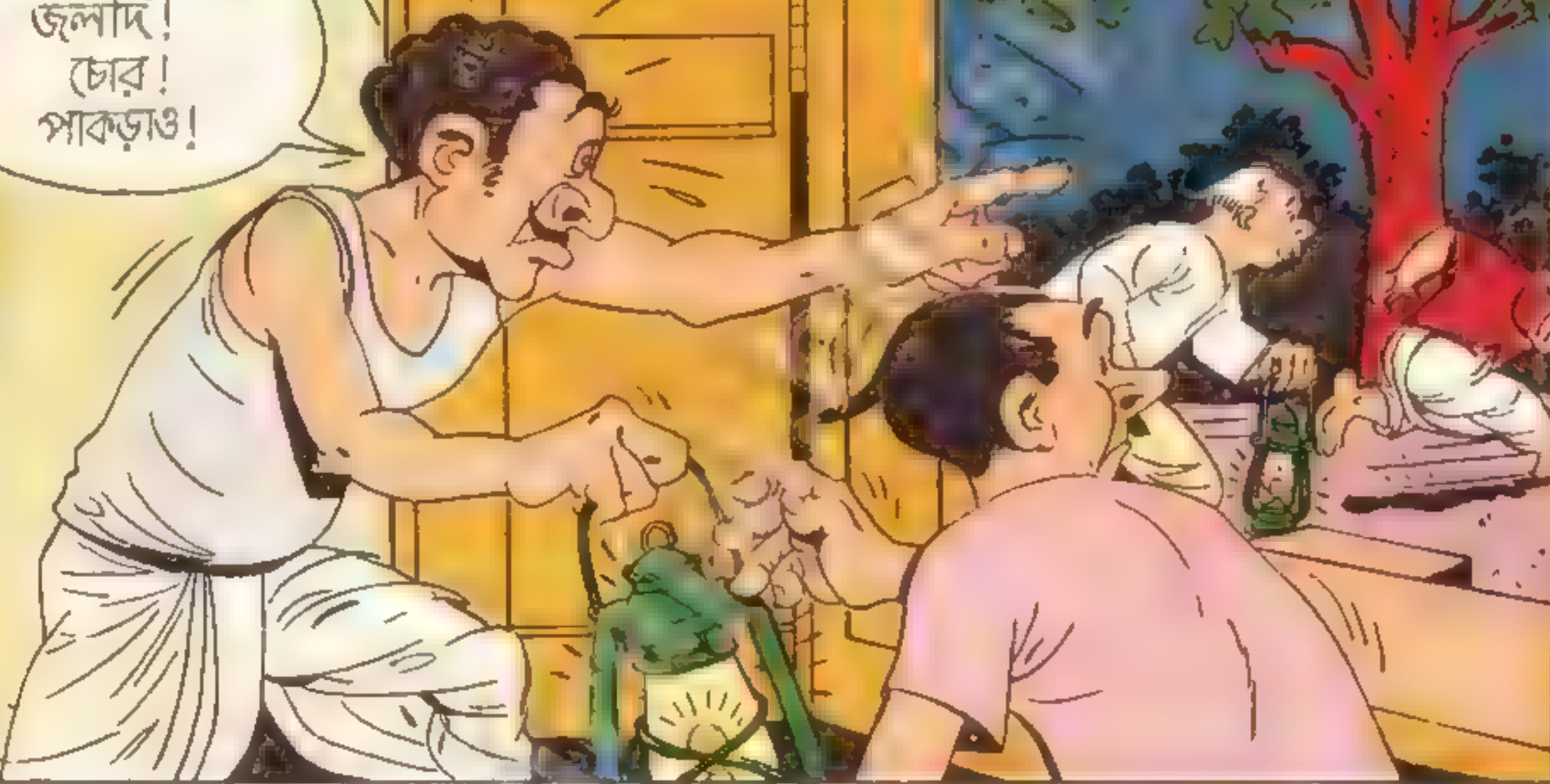
বাড়ির বাইরে —
লোকজন জেগে গেছে। এদিকেই আসছে! আমি এখন কি করি?

মরীয়া হয়ে সে যখন পালাবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়লো —

পোড়া কাঠ! ভাগ্য বোধহয় আমার সহায়!

সে পাগড়ি খুলে ফেলে দিল এবং সারা গায়ে ও কপালে পোড়া কাঠের ছাই মেখে নিল।

মনে হয়, এই ছদ্মবেশ কাজে লাগবে।

ঐ তো! একটা লোক!

রে! এ যে দেখছি সাধুবাবা!

আমাদের মাপ করুন!

ওরা চোর খুঁজতে লাগলো।

চোর পালিয়েছে! বরং বাগানে এক সাধুবাবাকে ধ্যানমগ্ন দেখলাম!
সাধুবাবা? এই বাগানে? চলো তো দেখে আসি।

ঐ তো!

আস্তে! সম্ভবত একজন বড় ধরনের সাধু। চলো, ওঁকে বিরক্ত করে কাজ নেই।
মনে হচ্ছে, গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর।

বাড়ির কর্তাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়েছি! কম চালাকি করলাম না!

পরের দিন, প্রভাতে —
এবার পালানো যাক! কিন্তু কারা যেন এদিকেই আসছেন!

প্রভু, আপনার কথা শুনে এসেছি। আমাদের আশীর্বাদ করুন!
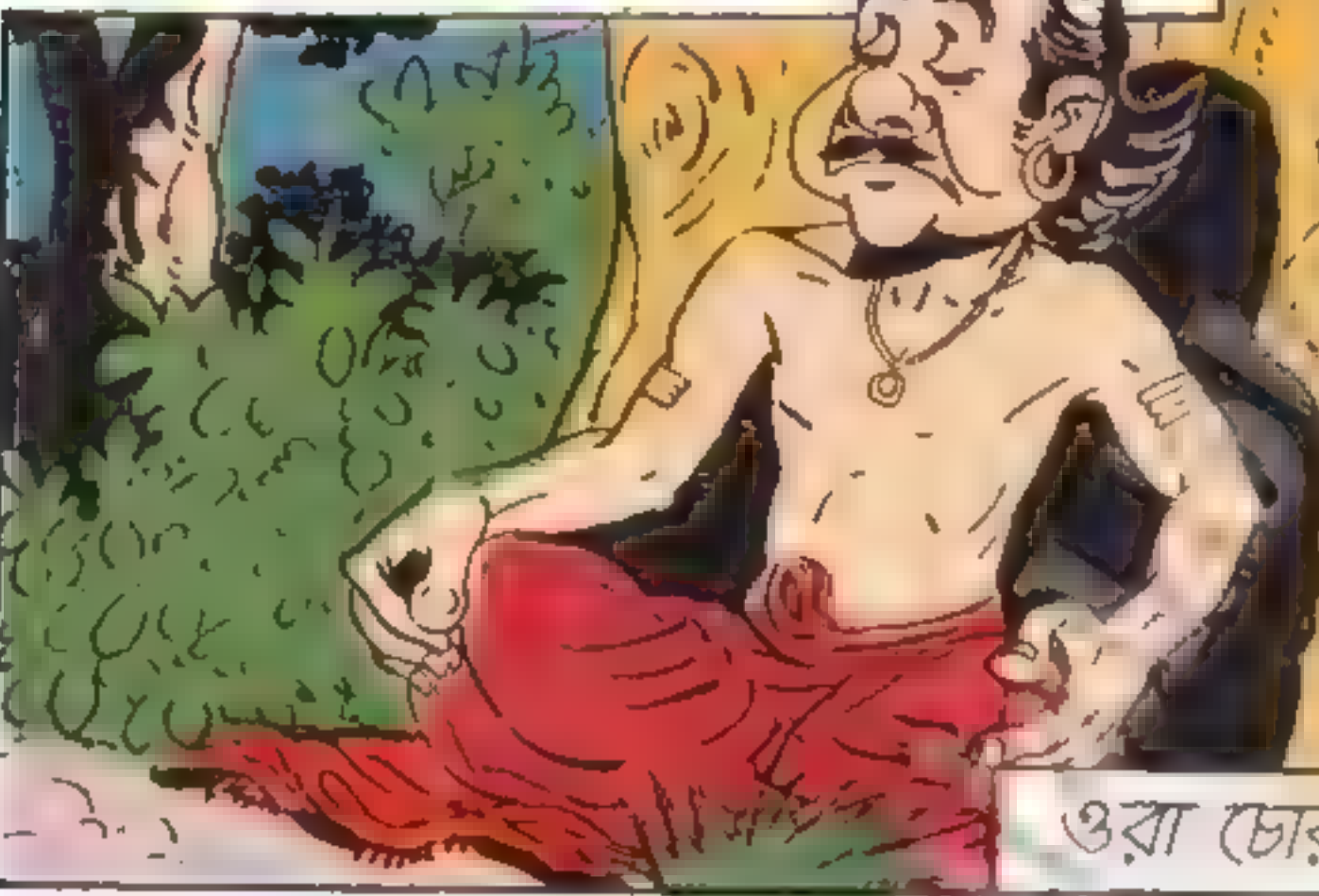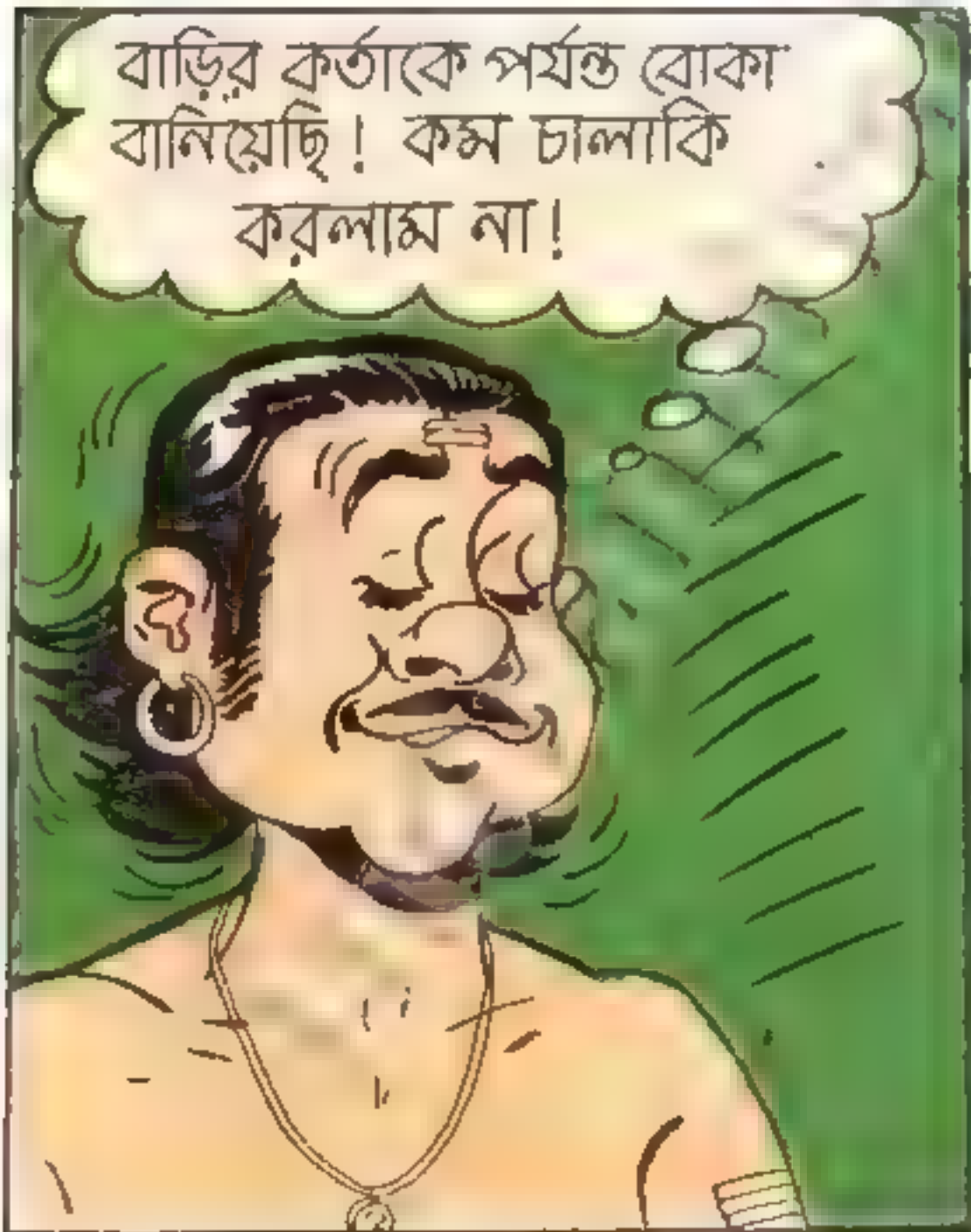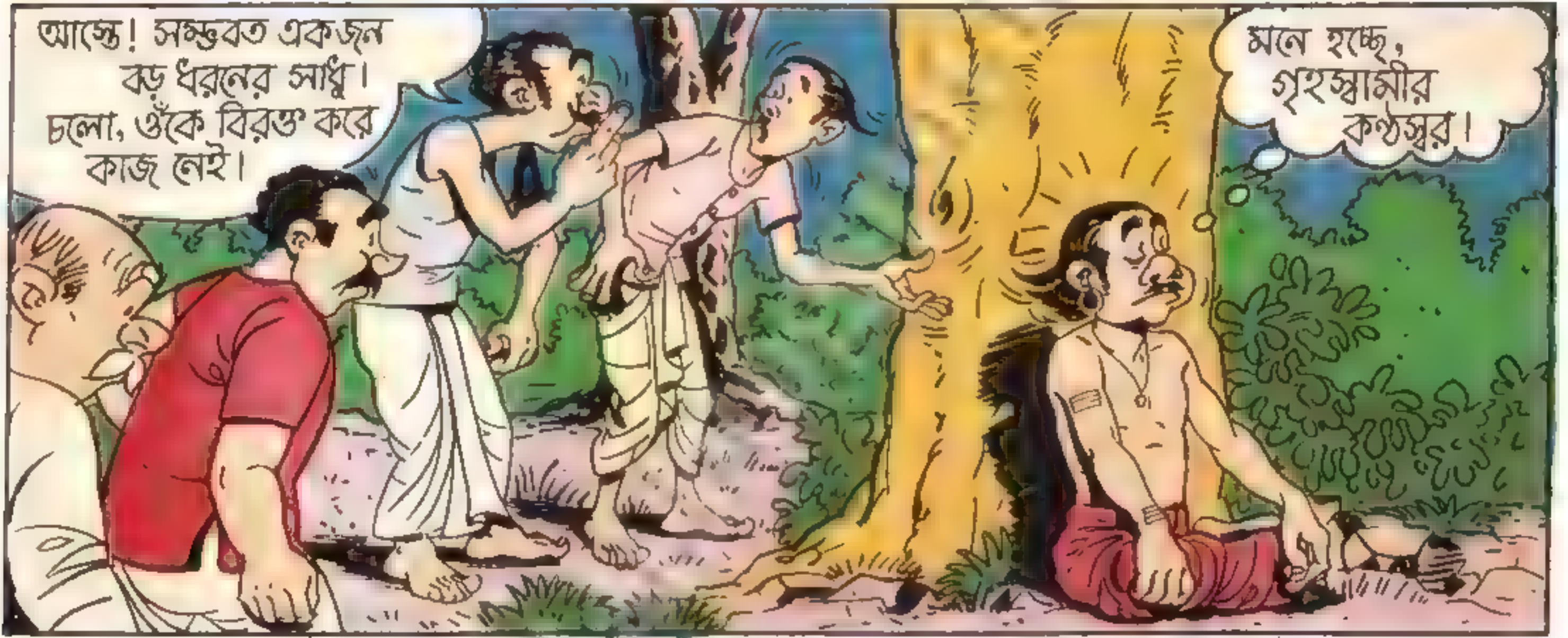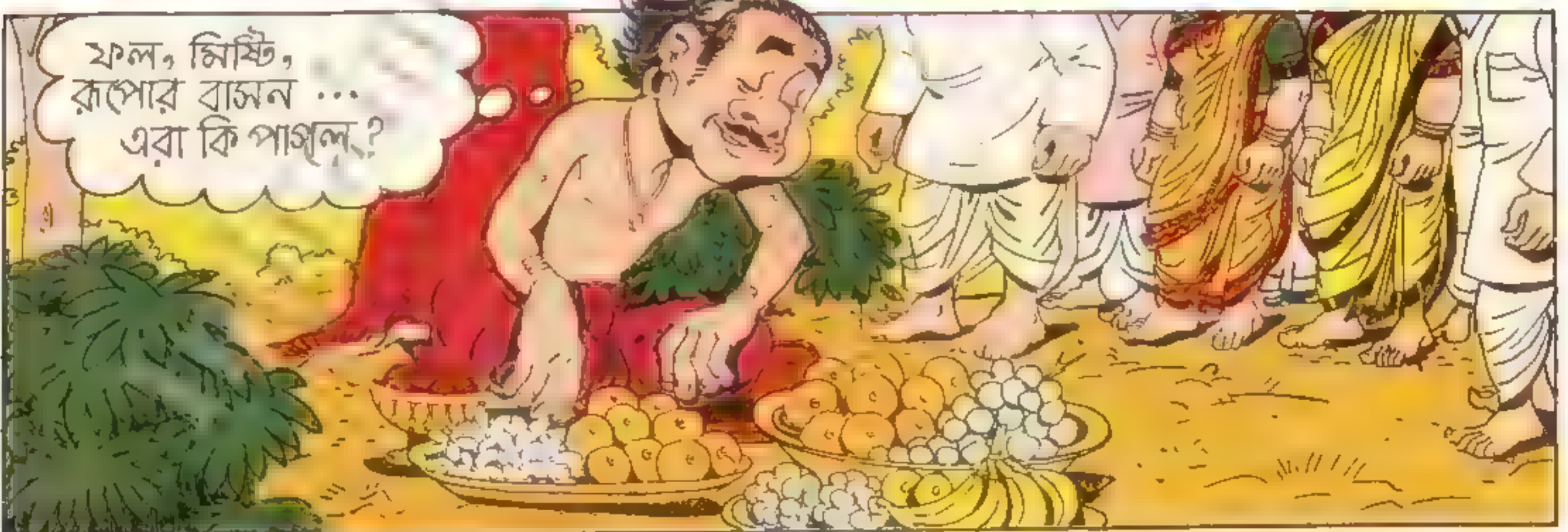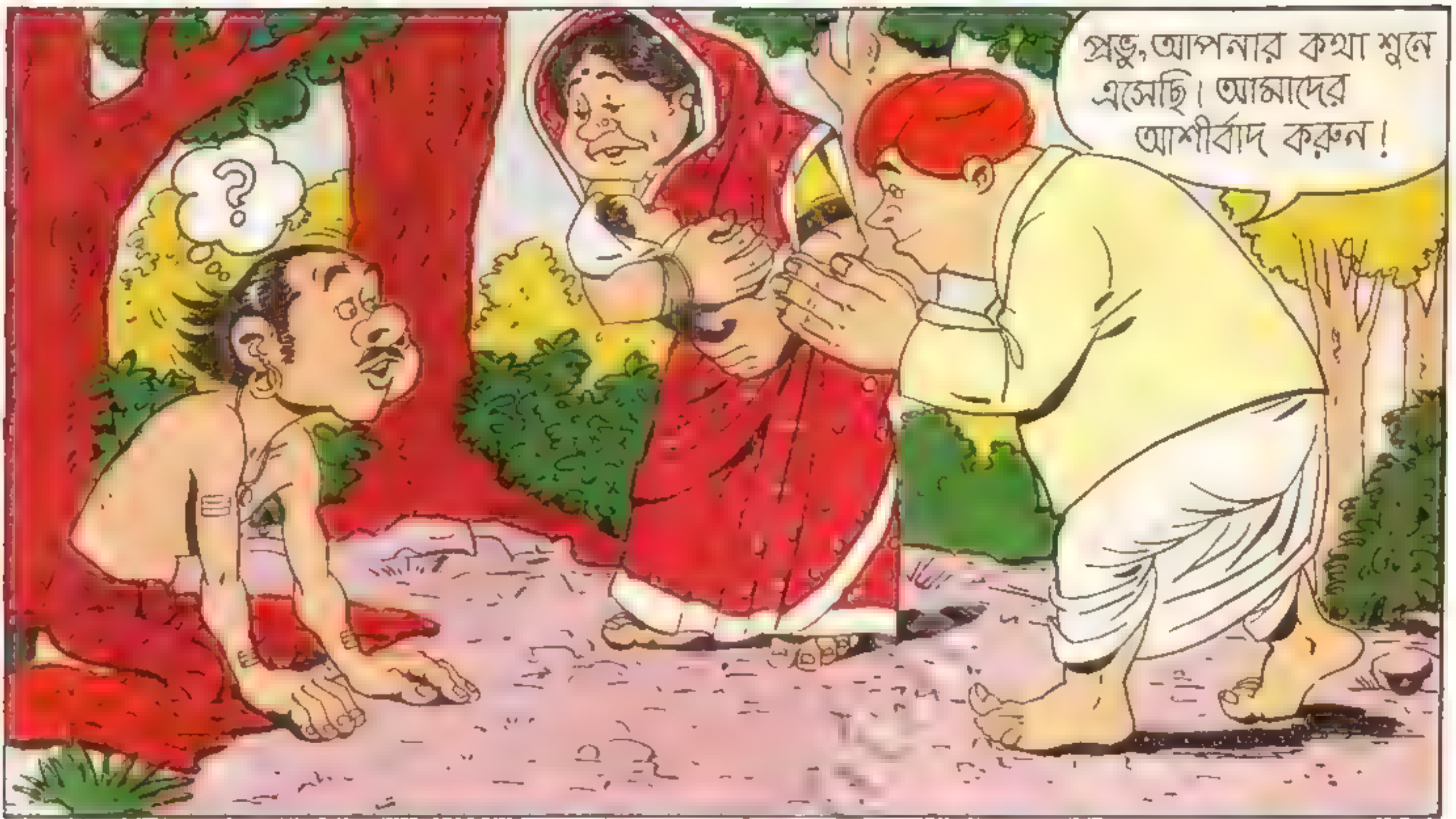
এবং সকলে কেমন দিব্যি ভক্তি গদগদ চিত্তে বসে আছে!
অথচ সত্যিকারের সাধুও নই আমি! তবুও এঁরা আমাকে কতো সম্মান দেখাচ্ছেন।
আর আমি যদি সত্যি-কারের সাধু হতাম তাহলে আমার কপালে না জানি আরও কতো সম্মান জুটতো!
হ্যাঁ, আমি এবার একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ হবো। আর চুরি করবো না!
এবং সেই চোর, যে ধার্মিক সেজেছিল তারপর থেকে সত্যি সত্যিই সে সাধু হয়ে গেল।

পথিক ও কল্পতরু বৃক্ষ
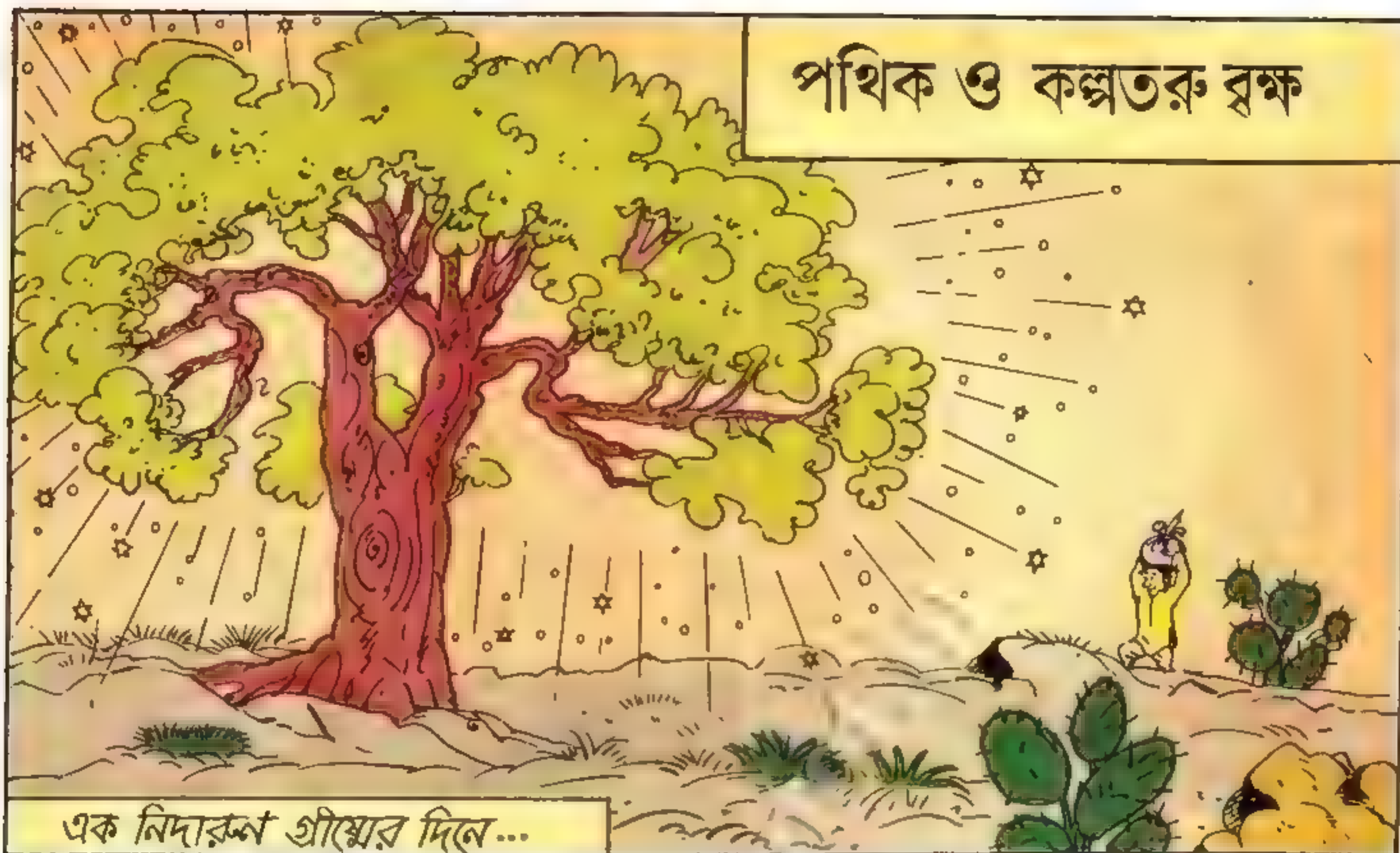
এক নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে...

অতঃপর—

কী আশ্চর্য! এ দেখছি, সত্যি সত্যিই বিছানা! স্বপ্ন দেখছি না তো!
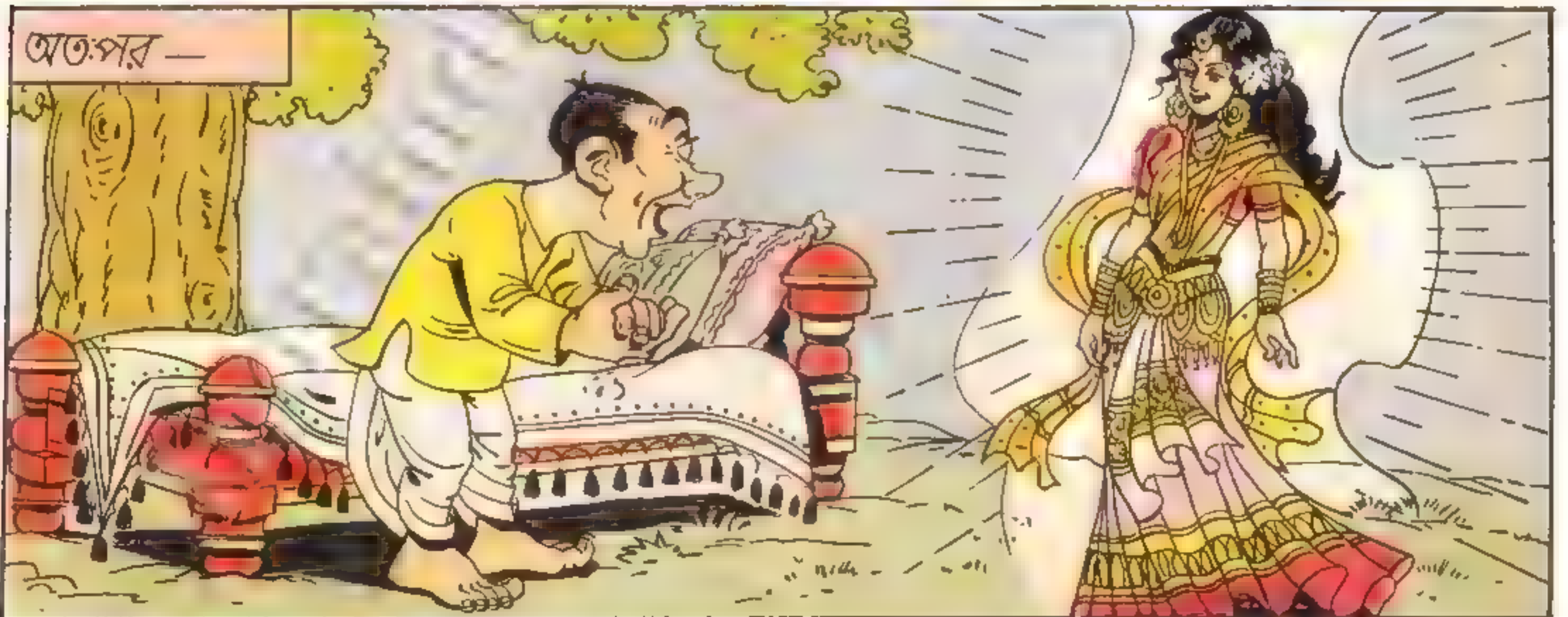
আজ আমার সত্যিকারের ভালো দিন!

কিছু পরেই—
সুন্দরী সঙ্গিনী থাকলে কি হবে! এ দিকে যে খিদের চোটে পেট গোলাচ্ছে। এখন যদি কিছু ভালো খাবার দাবার পাওয়া যেতো!

এ যে দেখছি রাজার ভোজ!

পথিকটি প্রাণভরে খেলো...

...এবং শুয়ে পড়লো।
এই হচ্ছে চরম সুখের পরম মুহূর্ত! এই সুখ নিমেষেই মিলিয়ে যেতে পারে, এখন যদি একটা বাঘ এসে হানা দেয়...

ইয়া-আ-আ!

পথিকটি একটা গাছের উপরে উঠলো।

গাছের ছায়াতেই যদি খুশি থাকতাম তাহলে আর এমনি ভাবে হিংস্র বাঘের দয়া ভিক্ষা করতে হতো না!

সাধু এবং তাঁর কৌপিণ

এক গ্রামের কাছাকাছি এক বনে এক গুরু ও তাঁর শিষ্য বাস করতেন। তাঁরা বেশির ভাগ সময় ধ্যান ও প্রার্থনা করে কাটাতেন।

এক দিন —

বৎস, তোমাকে কিছু দিন একা থাকতে হবে। আমাকে তীর্থভ্রমণে যেতে হবে।

স্মরণ রেখো, আমার শিক্ষা। সর্বদা সরল জীবন যাপন করবে।

অবশ্যই, গুরুদেব!

গুরু চলে গেলেন।

শিষ্য অন্য দিনের মতো সকালে যথারীতি তাঁর অপর পরিধেয় বস্ত্রটি কাচলেন ...
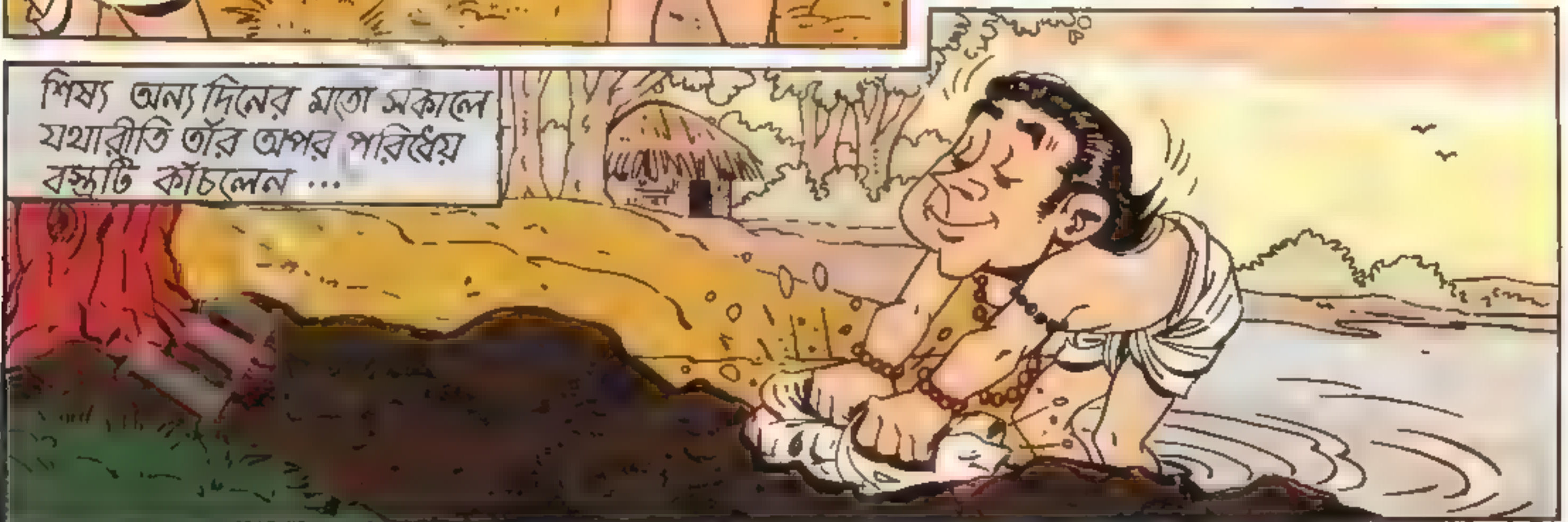
...এবং শুকোতে দিলেন।
এইবার গ্রামে ভিক্ষার জন্যে বের হতে হবে।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!
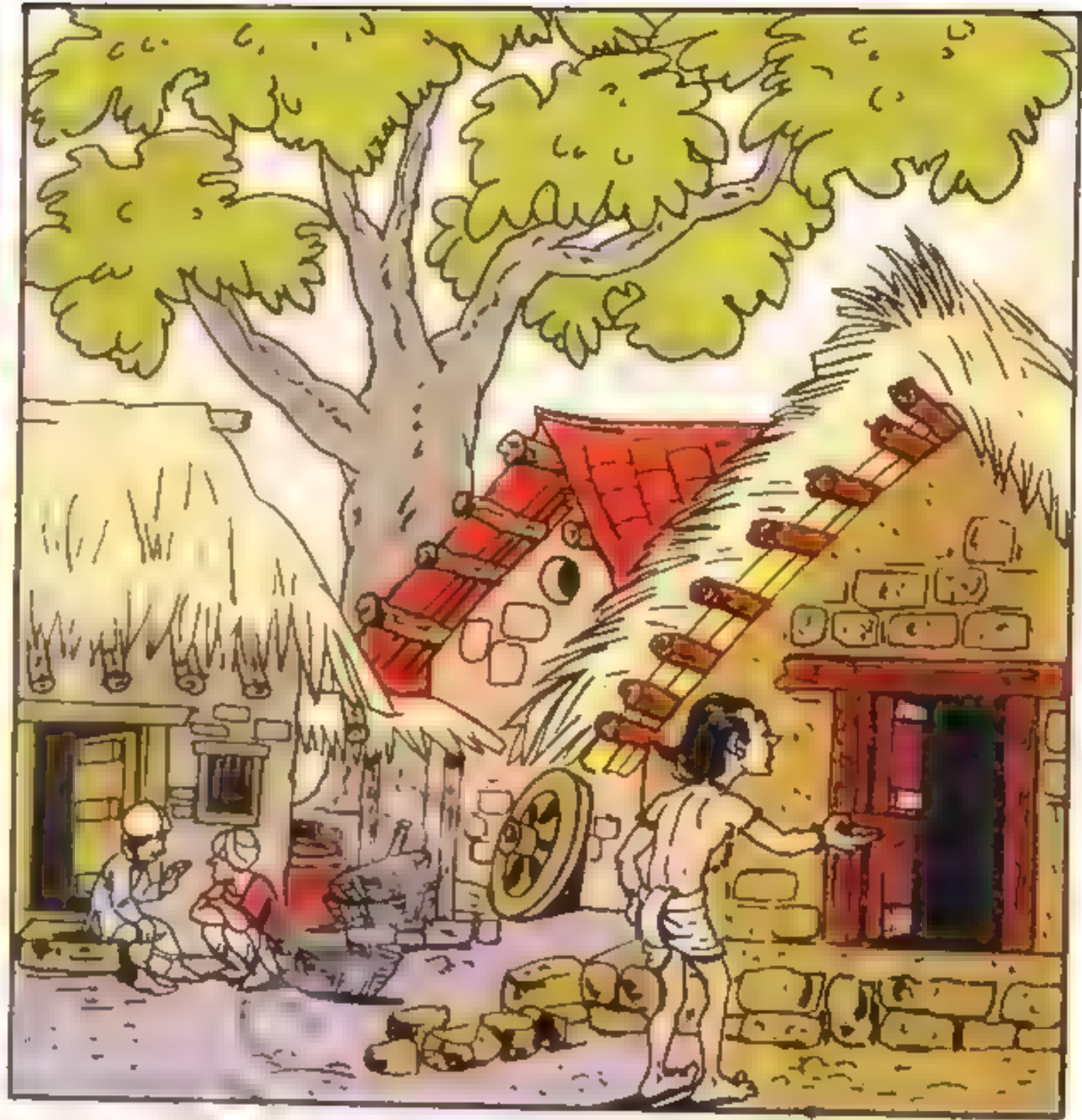
পরে, কুটিরের কাছাকাছি সাধু ফিরে এলে —
আমার কৌপিনের টুকরো মনে হচ্ছে!
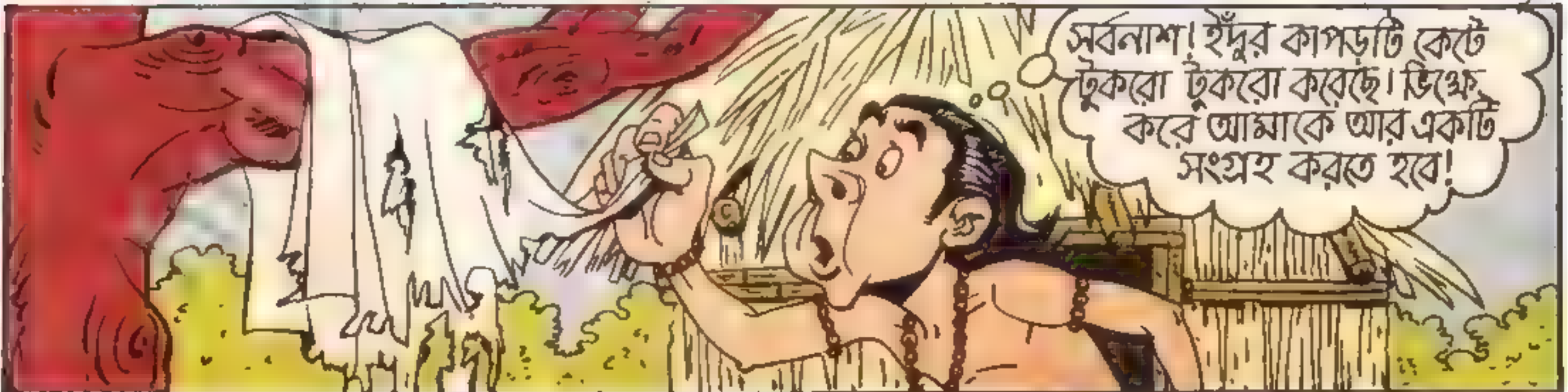
সর্বনাশ! ইঁদুর কাপড়টি কেটে টুকরো টুকরো করেছে। ভিক্ষে করে আমাকে আর একটি সংগ্রহ করতে হবে!

পর দিন, গ্রামে—
মা, আমাকে একখানি কাপড় দিতে পারেন?
কাপড়?
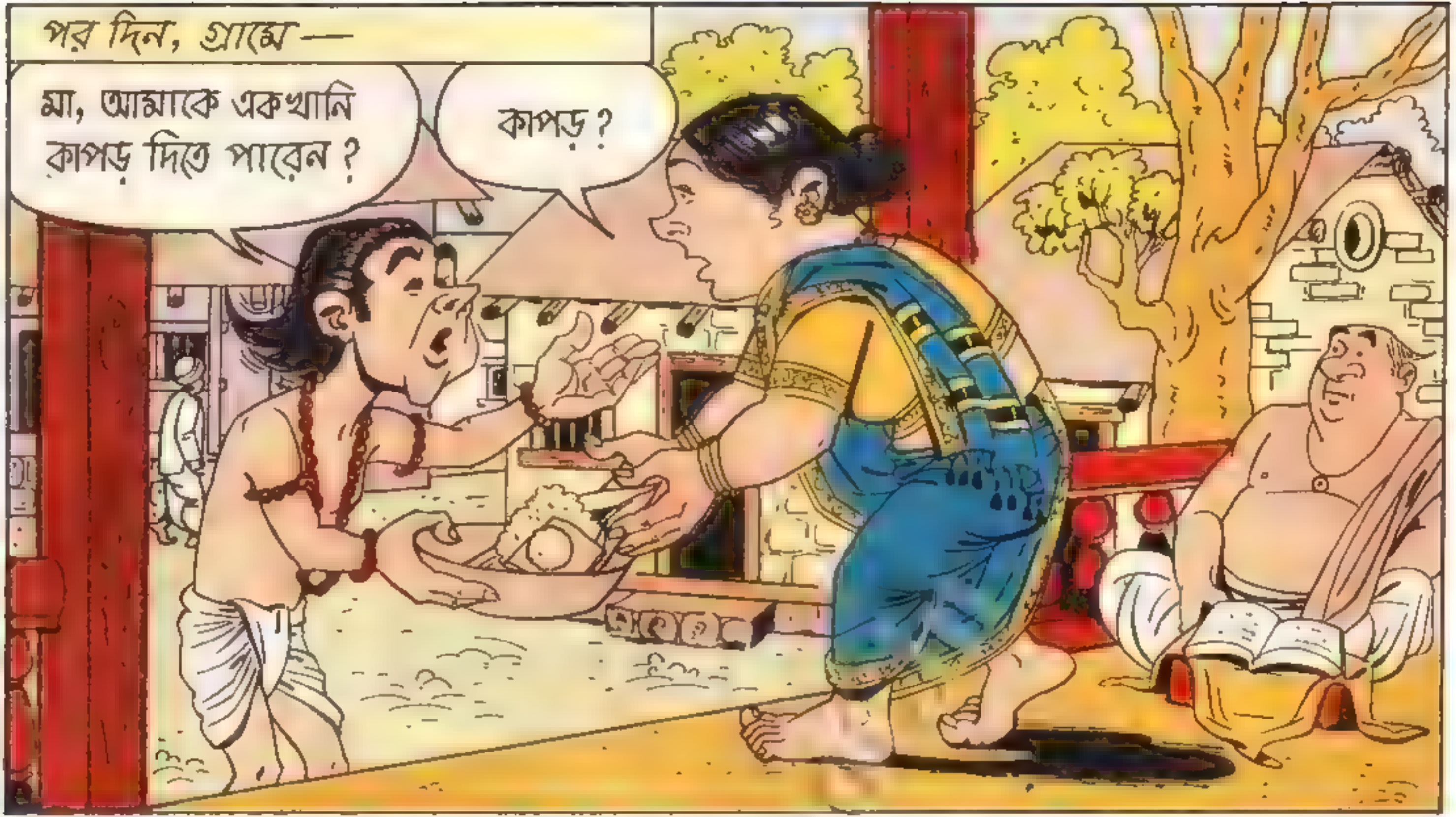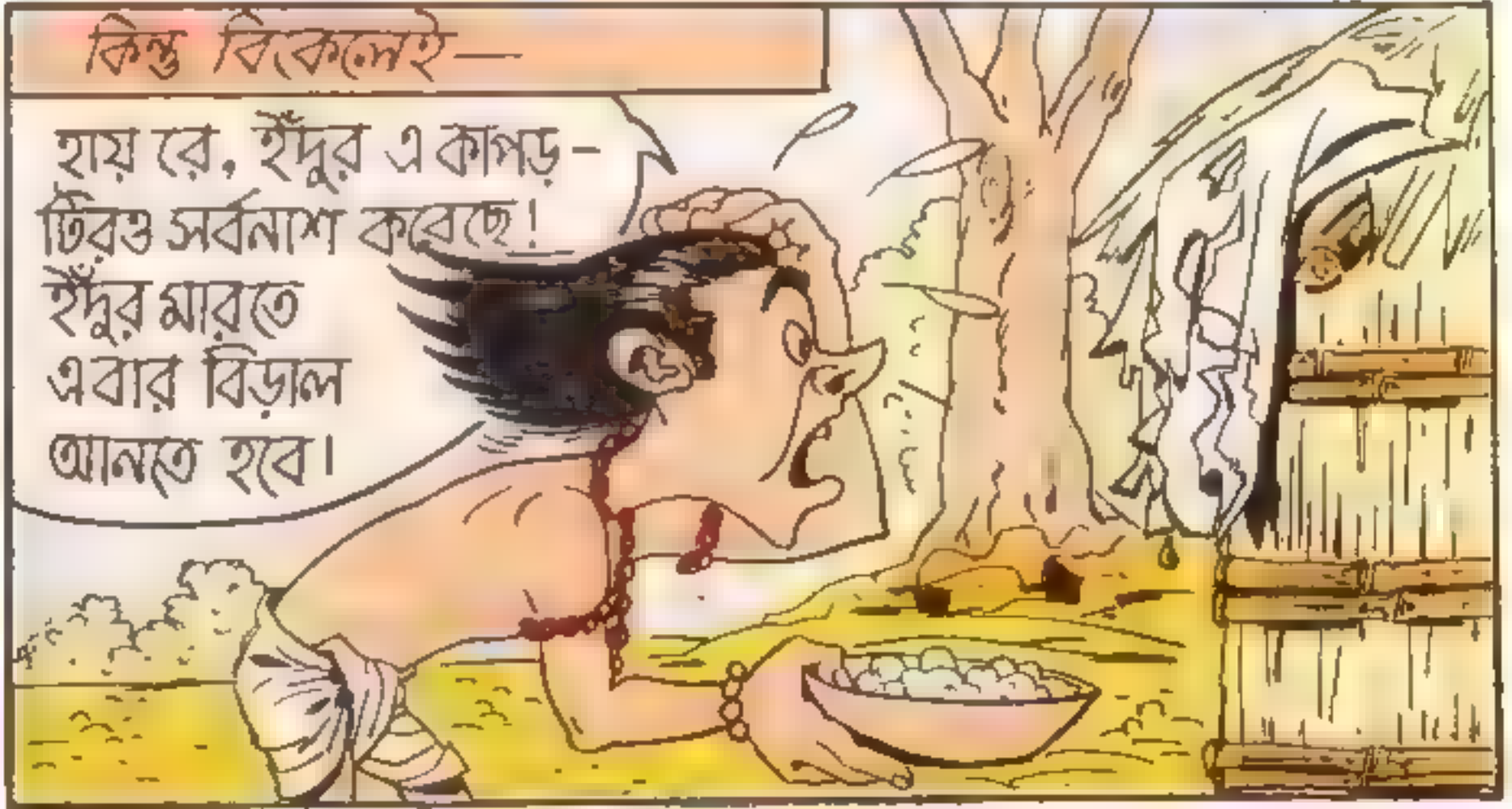
সাধু বিড়াল নিয়ে এলেন এবং যথারীতি...
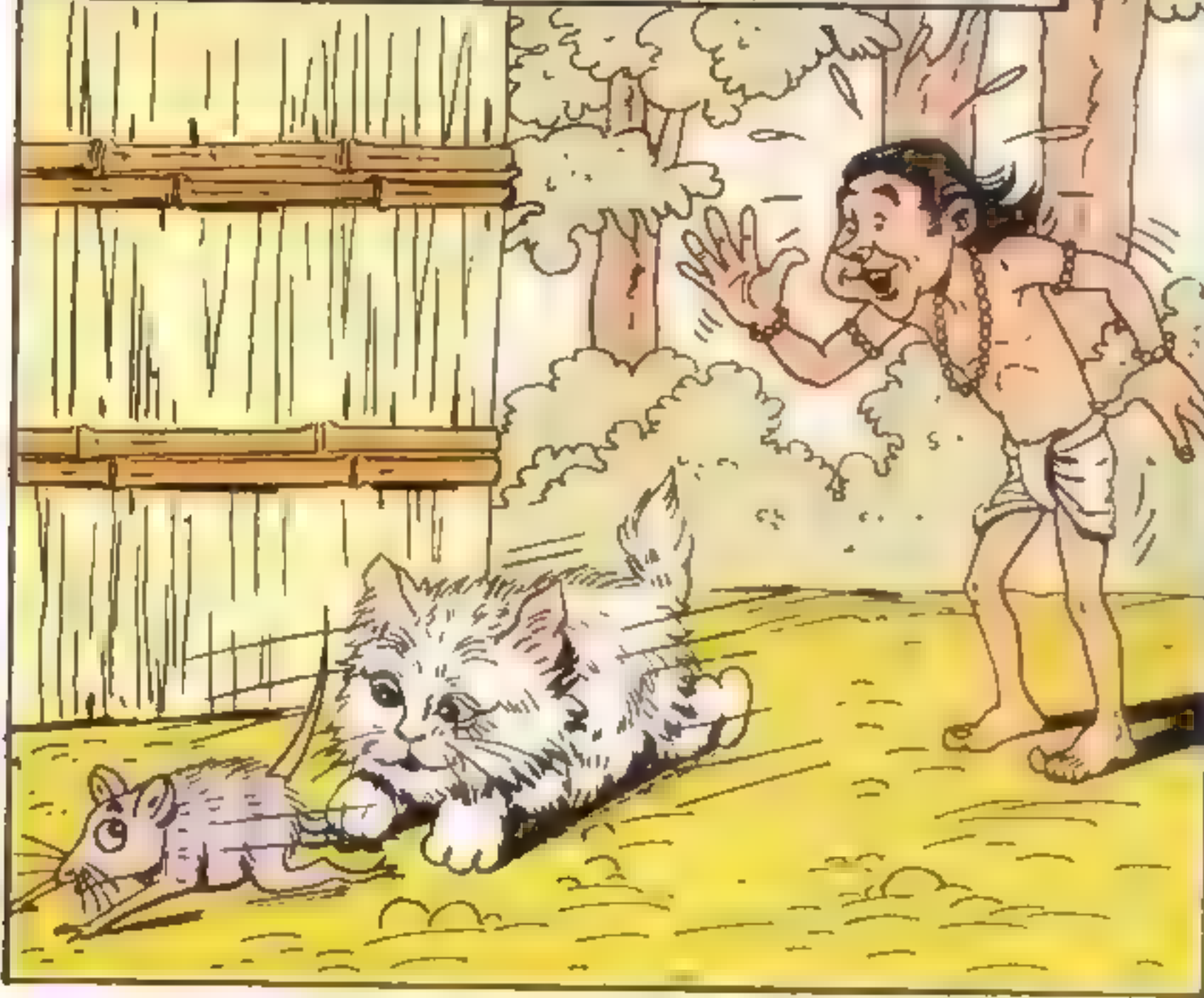
...ইঁদুরের দৌরাত্ম্য কমে গেল।
বিড়ালটির যত্ন করতে হবে। আমি জানি সেজন্য কি করা দরকার। একটা গরু পুষতে হবে।

গরু নিয়ে এলেন সাধু।
বিড়াল এবার মনের সুখে দুধ খেতে পারবে।

কিন্তু গরুর খাবারের জন্যে খড় বিচালি চাই। এখন কোথা থেকে পাওয়া যাবে?
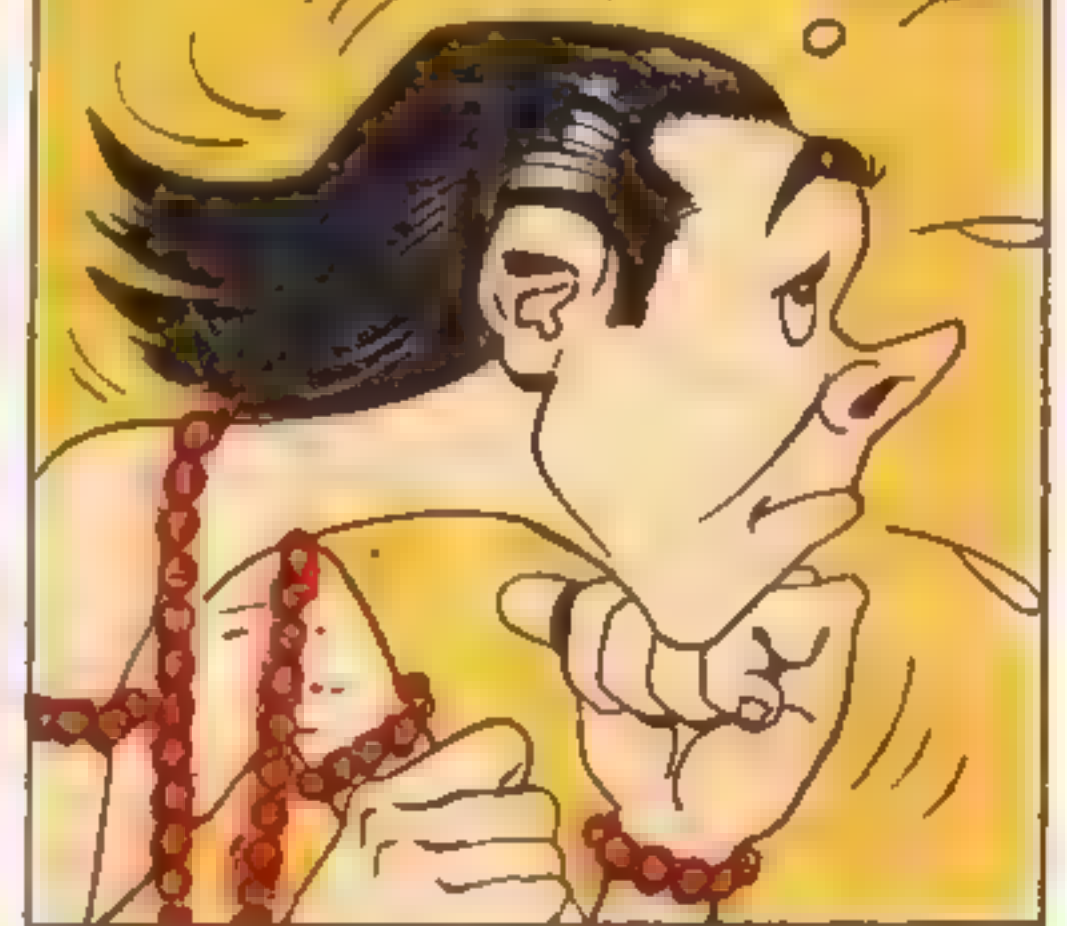
কুটিরের চার পাশের জমি চাষ করলেই তো হয়। ফসল ঘরে উঠলে তখন তো আর গরুর জন্যে খড় বিচালির অভাব হবে না!
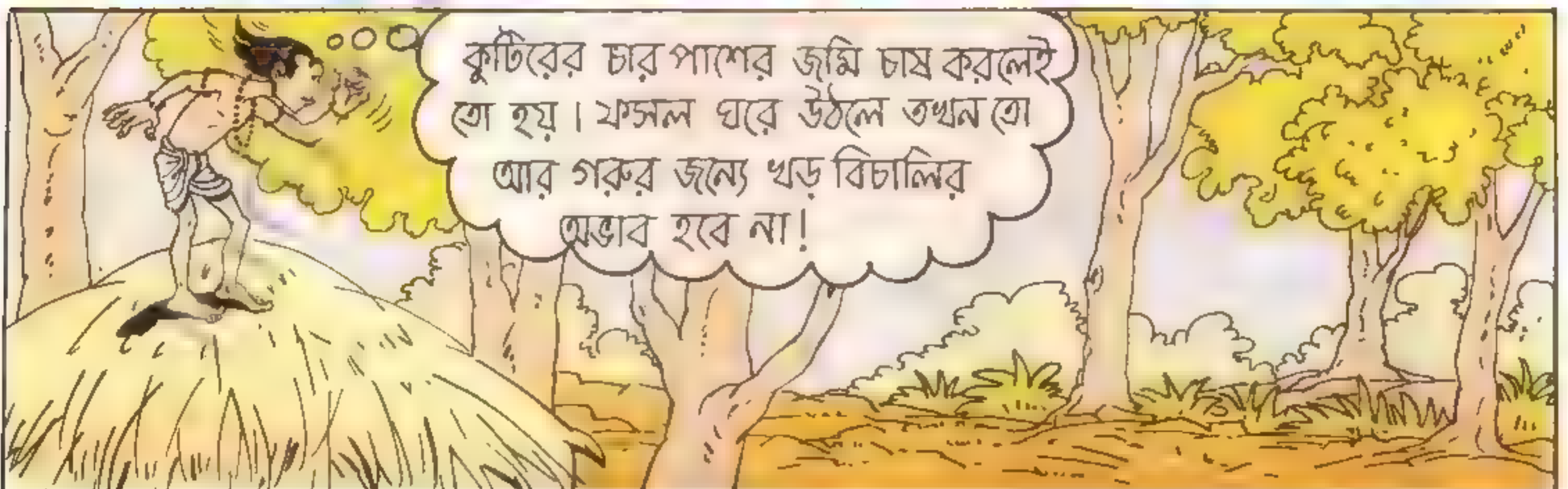
তারপর—
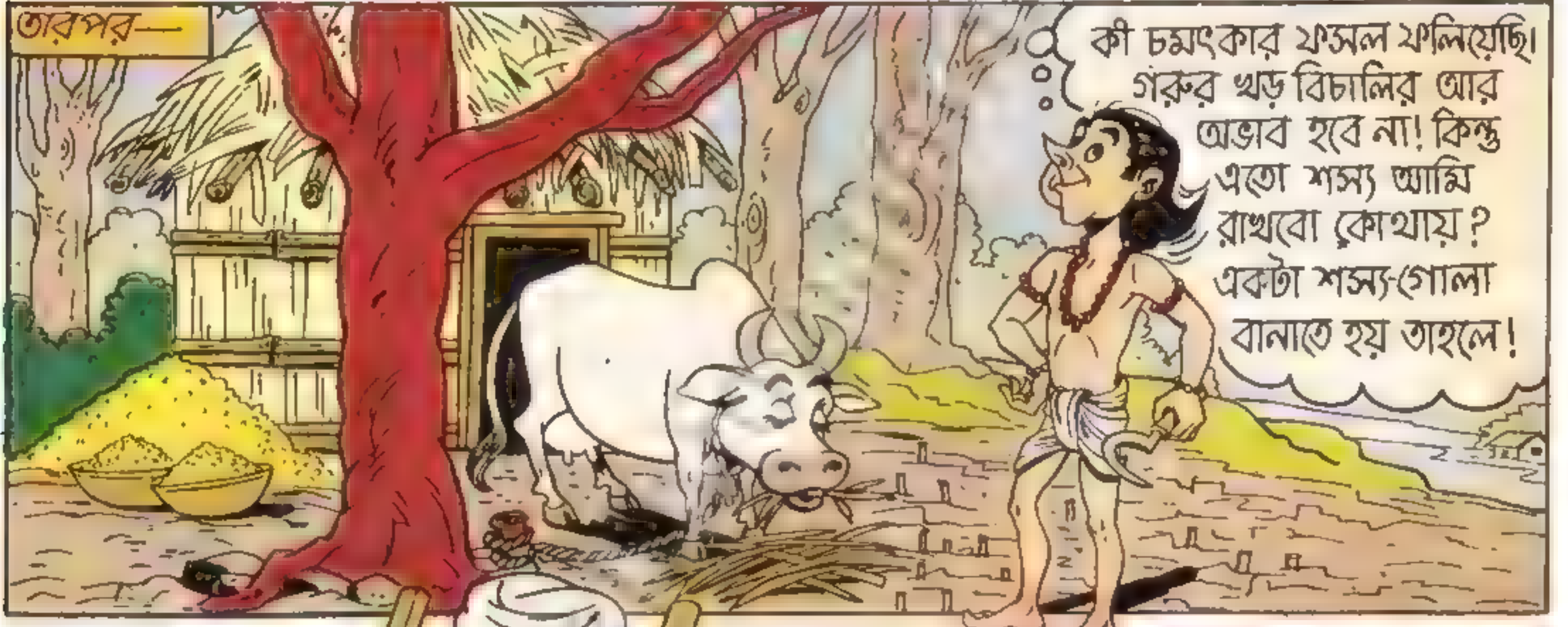
কী চমৎকার ফসল ফলিয়েছি! গরুর খড় বিচালির আর অভাব হবে না! কিন্তু এতো শস্য আমি রাখবো কোথায়? একটা শস্য-গোলা বানাতে হয় তাহলে!

অতঃপর সাধু মিস্ত্রি ডেকে শস্য-গোলা বানাতে শুরু করলেন।

দেখুন, আর উঁচু করবো কিনা?

আর একটু উঁচু করতে হবে। প্রচুর শস্য রাখতে হবে।

সাধু ক্রমে অনেক সম্পত্তির মালিক হলেন।
স্ত্রী থাকলে আমাকে নানা কাজে সাহায্য করতে পারতেন। এজন্য বিয়ে করা দরকার।

অতঃপর—
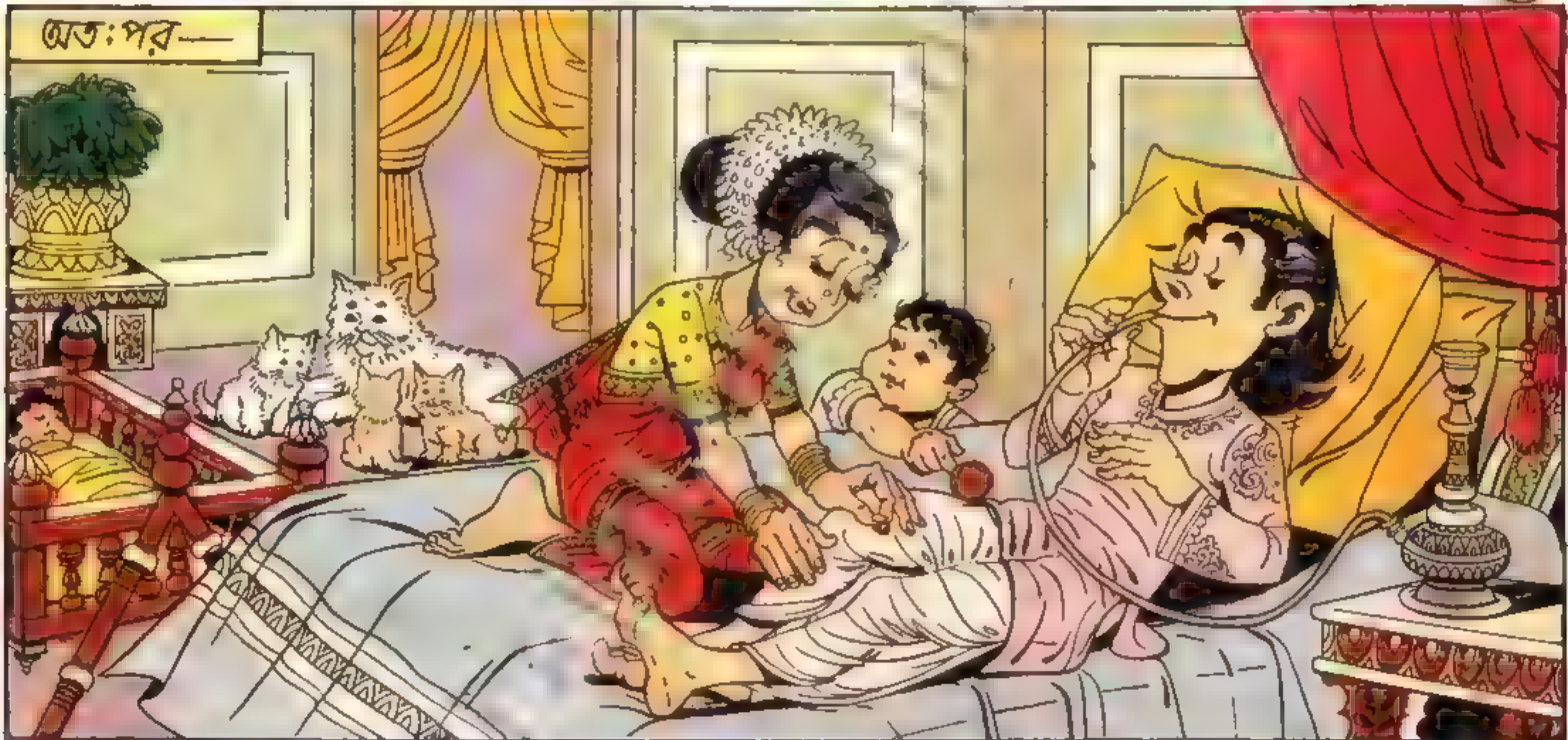
তীর্থ যাত্রা শেষ করে গুরুদেব একদিন ফিরলেন।
পথ ভুল করছি না তো? আমার শিষ্যের কুটিরখানি কোথায়?

হয়তো কোনও ধনী ব্যক্তি বেচারাকে এখান থেকে হটিয়ে দিয়ে এই সব বাড়ি ঘর বানিয়েছে!

এবং গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁর পদপ্রান্তে এসে পড়লেন।

বৎস, এই সমস্ত কি সব দেখছি? আমি তোমাকে সন্ন্যাসীর সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখছি তোমার চারপাশে ভোগের সামগ্রী।এসব পেলে কী করে?

গুরুদেব, এর মূলে আমার একটি মাত্র কৌপিন। ইঁদুরের হাত থেকে সেটিকে রক্ষা করতে বিড়ালের প্রয়োজন হয় এবং সেই থেকে একে আর সমস্ত চাহিদা দেখা দেয়! আমাকে মার্জনা করুন, প্রভু!
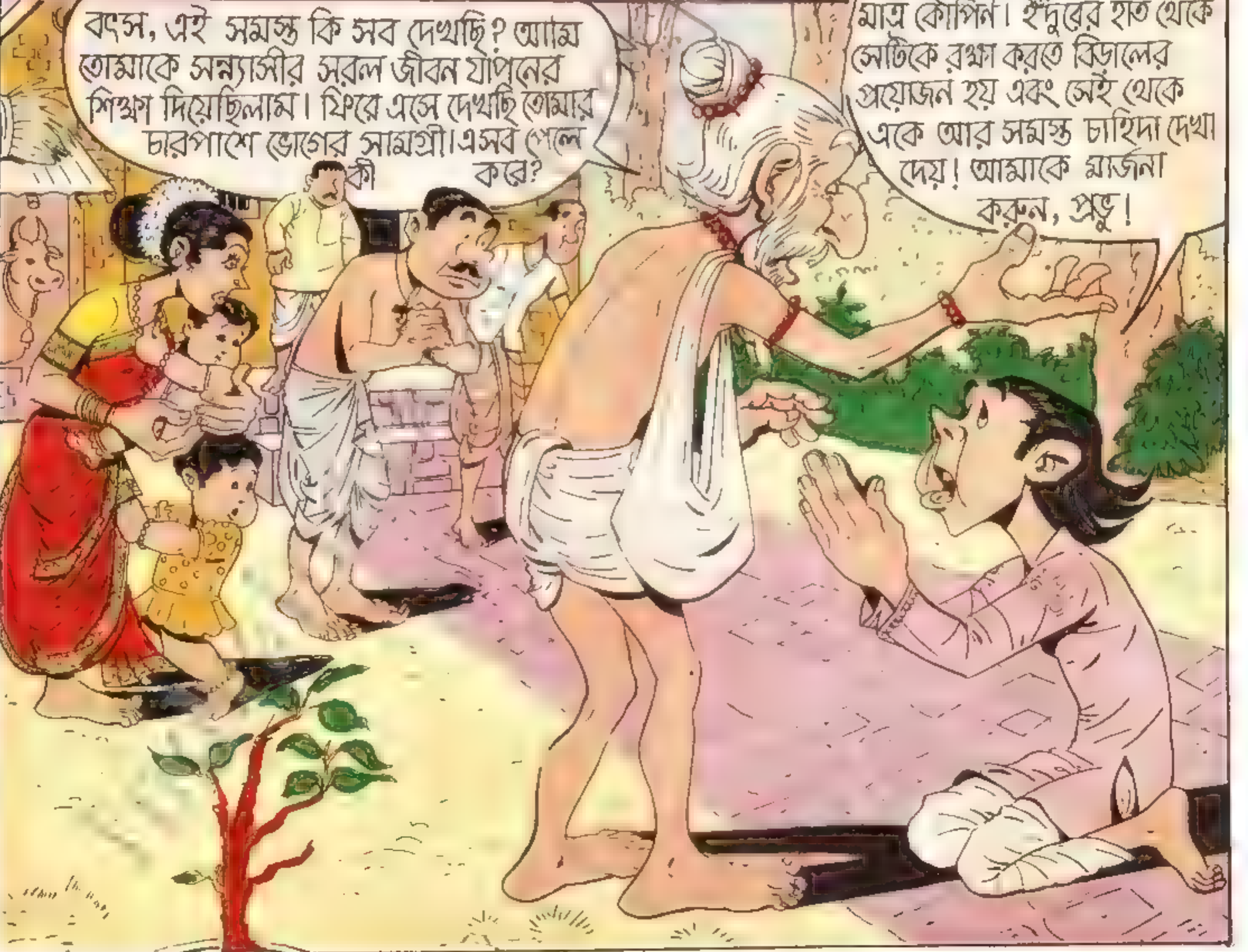
যে যার মতন
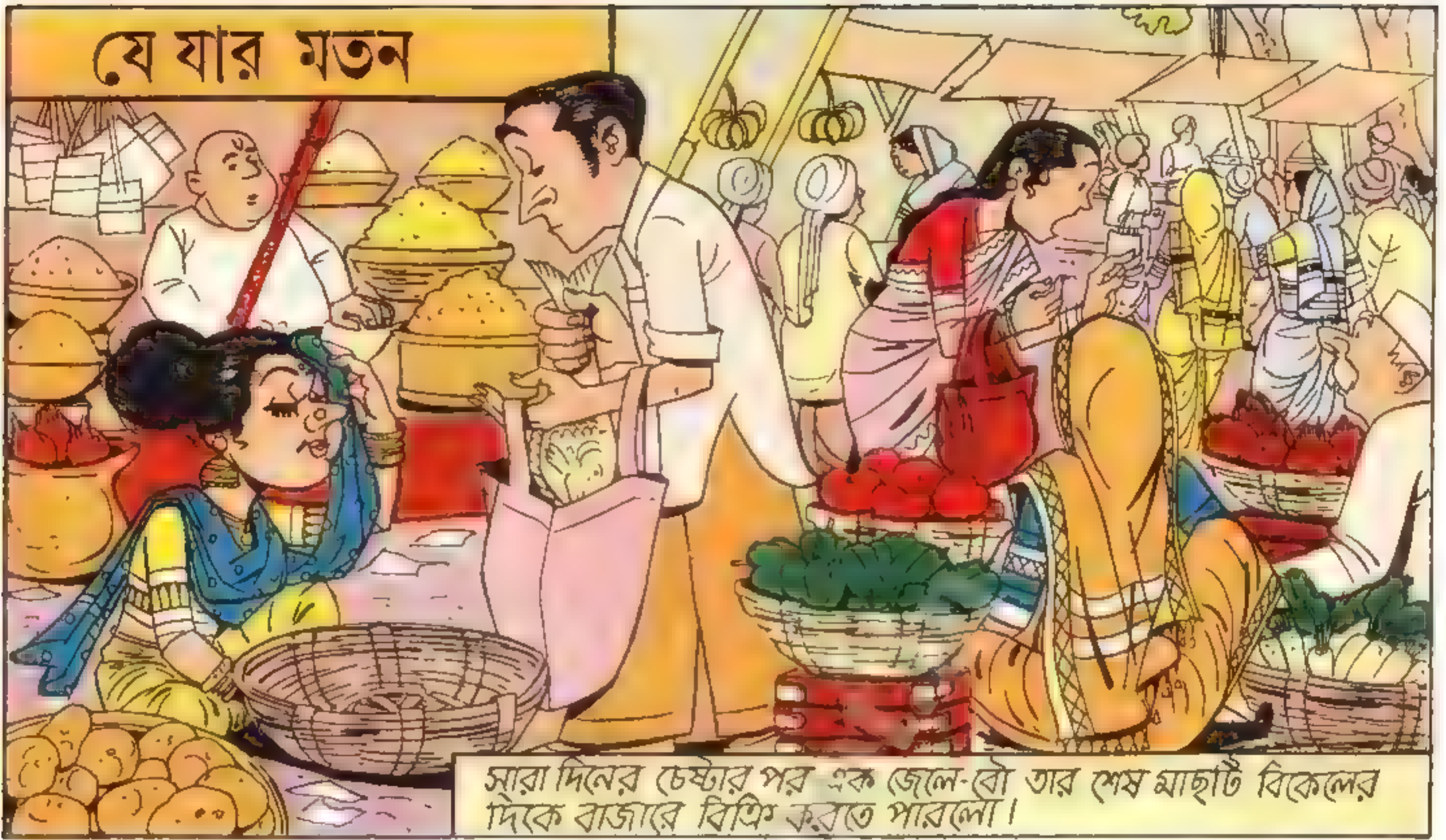
সারা দিনের চেষ্টার পর এক জেলে-বৌ তার শেষ মাছটি বিকেলের দিকে বাজারে বিক্রি করতে পারলো।
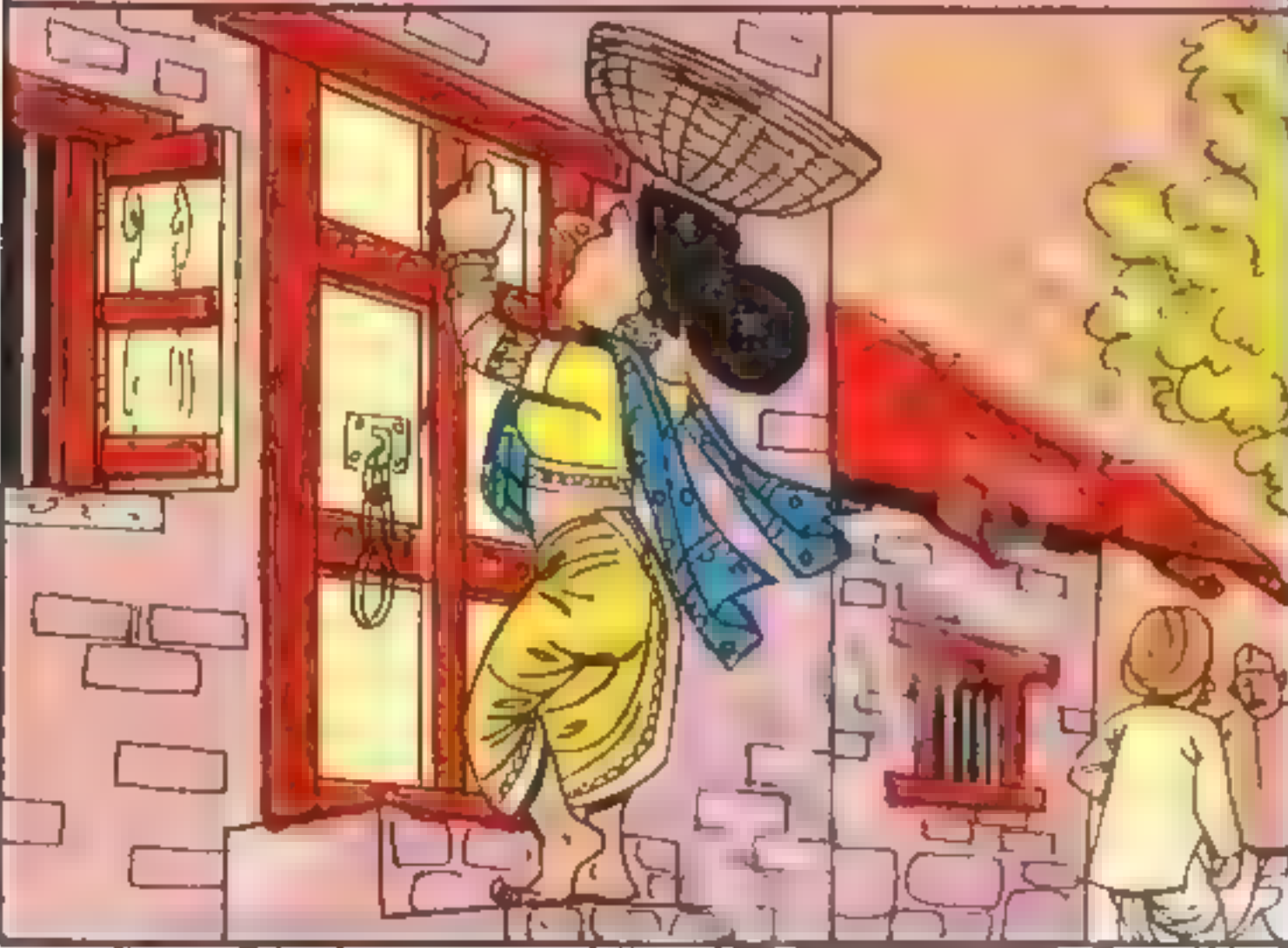
রাতে, ঘুমাতে যাবার সময়—
যে ঘরটায় আমার ফুল থাকে সেই ঘরটায় আমরা ঘুমাবো। তোমার ভালো লাগবে।

আহ! কী চমৎকার ঘরখানি!

পরে—
কী হয়েছে? এতো উসখুশ করছো কেন?
কেমন যেন ঘুম আসছে না।

মনে হচ্ছে, এর কারন এই ফুলের গন্ধ! আমি সহ্য করতে পারছি না!

একটা উপায় আছে। আমার মাছের ঝুড়িটি এখানে আনবো?
দাঁড়াও! আমি এনে দিচ্ছি।

বন্ধু ঝুড়িটি অন্য ঘর থেকে নিয়ে এলো।

জলে-বৌ ঝুড়িটি নিয়ে তাতে ...
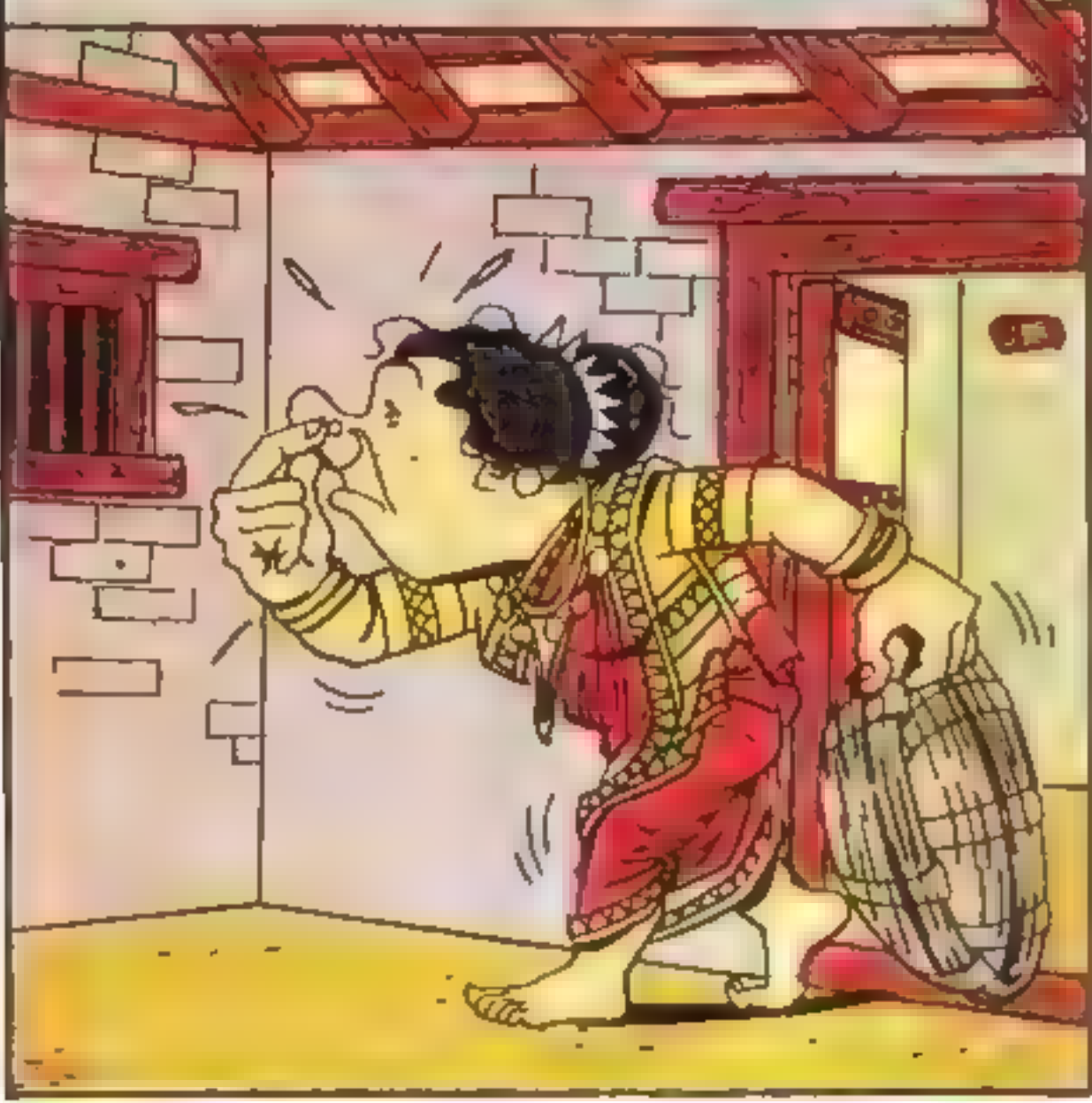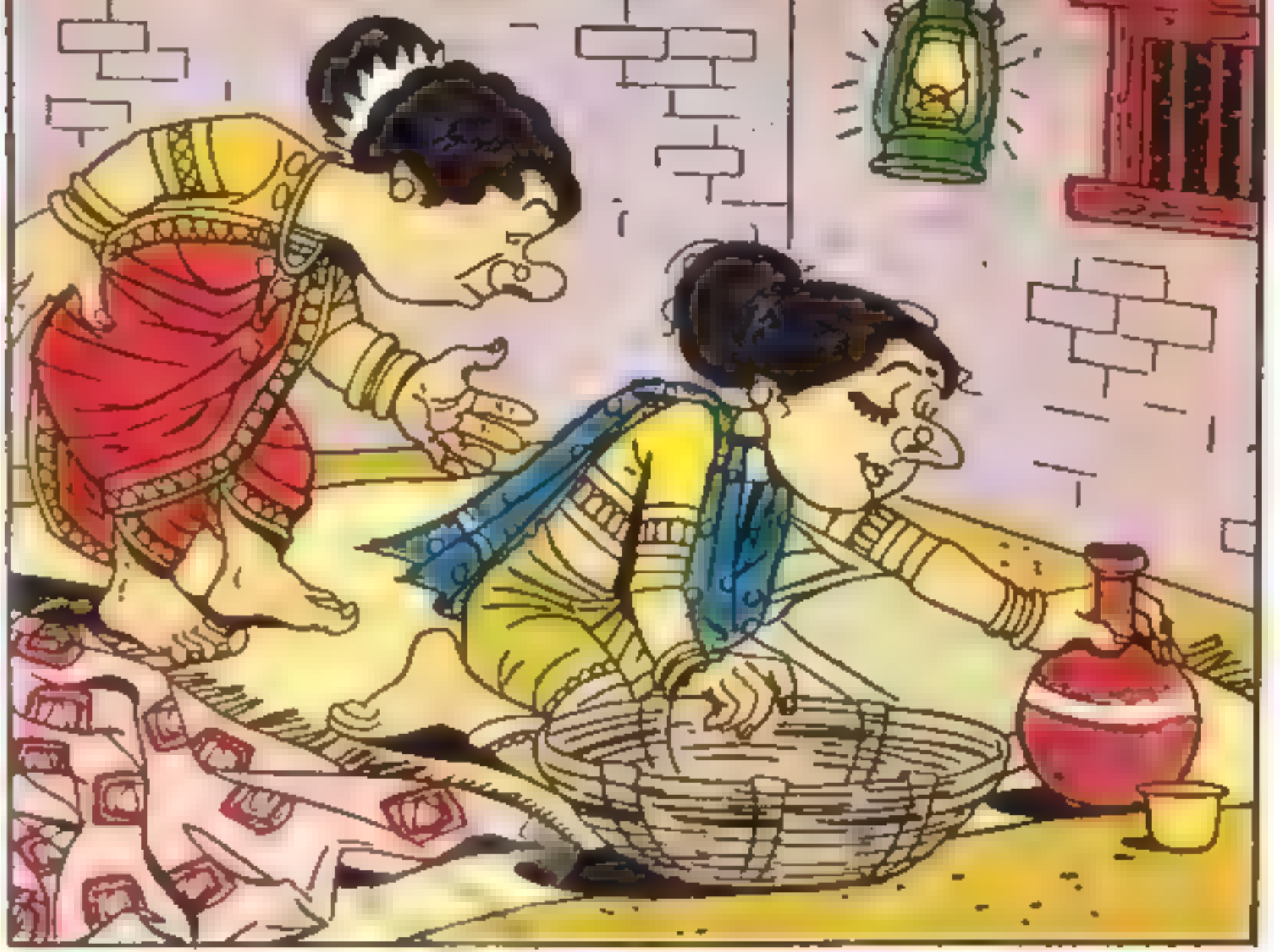
... জল ছিঁটালো।
উঃ! কী দুর্গন্ধ!
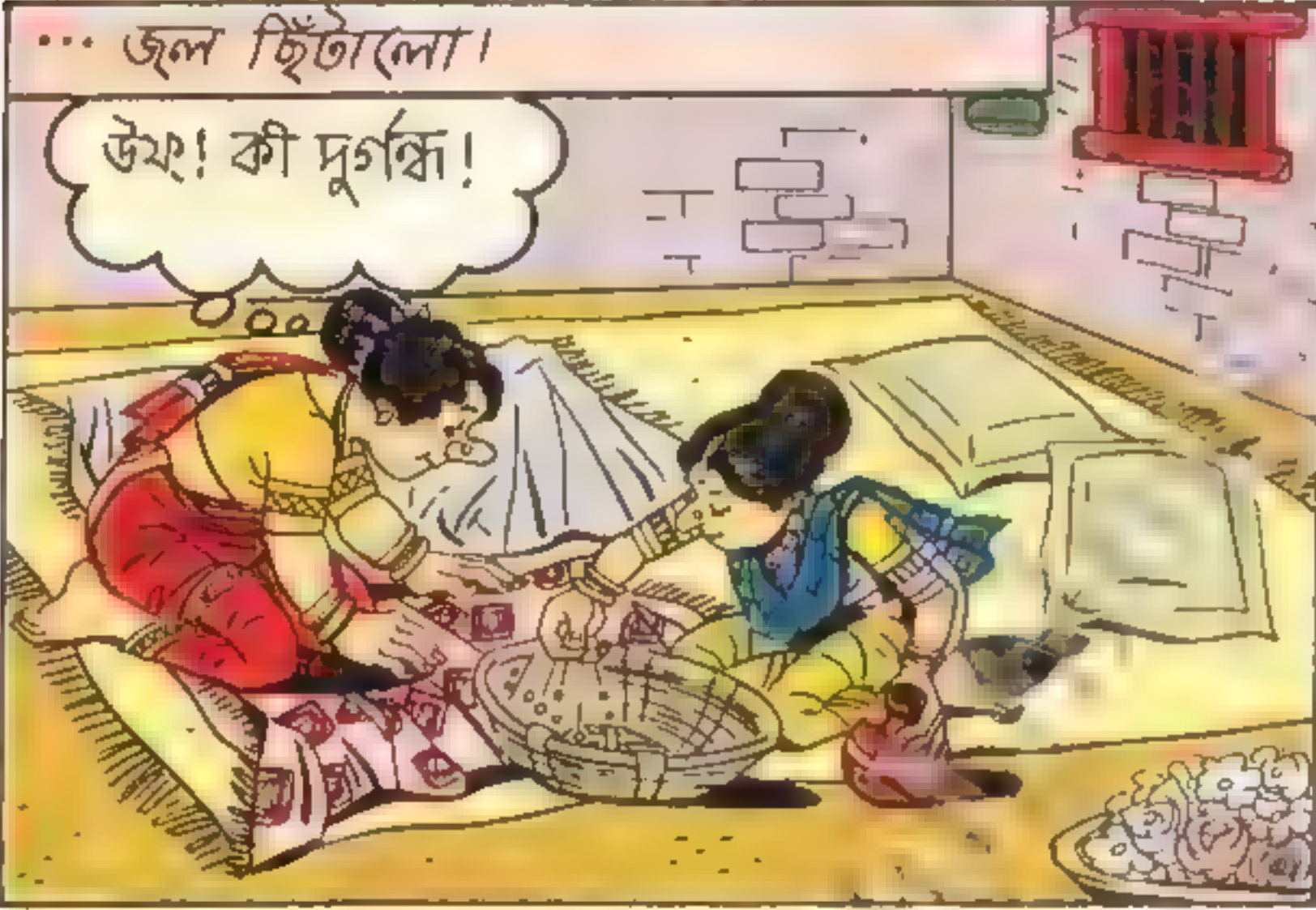
আহ্! এখন অনেকটা ভালো লাগছে। এইবার দিব্যি ঘুমিয়ে পড়বো।

এবং আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো ও নাক ডাকতে শুরু করলো।
অবাক কান্ড! ফুলের গন্ধ ওর সহ্য হলো না, অথচ আঁশ্টে গন্ধে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লো। কি জানি, যে যাতে অভ্যস্থ সে তাতেই সুখ পায় হয়তো!

ফকির এবং নবাব

একদিন এক ফকির এক নবাবের প্রাসাদে ভিক্ষার জন্য গেলেন।

মহাশয়, আমি একবার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
সোজা চলে যান। তিনি এখন প্রার্থনা-গৃহে আছেন।

ফকির প্রাসাদের মধ্য দিয়ে সোজা পৌঁছে ...

...গেলেন প্রার্থনা-গৃহে।
প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।
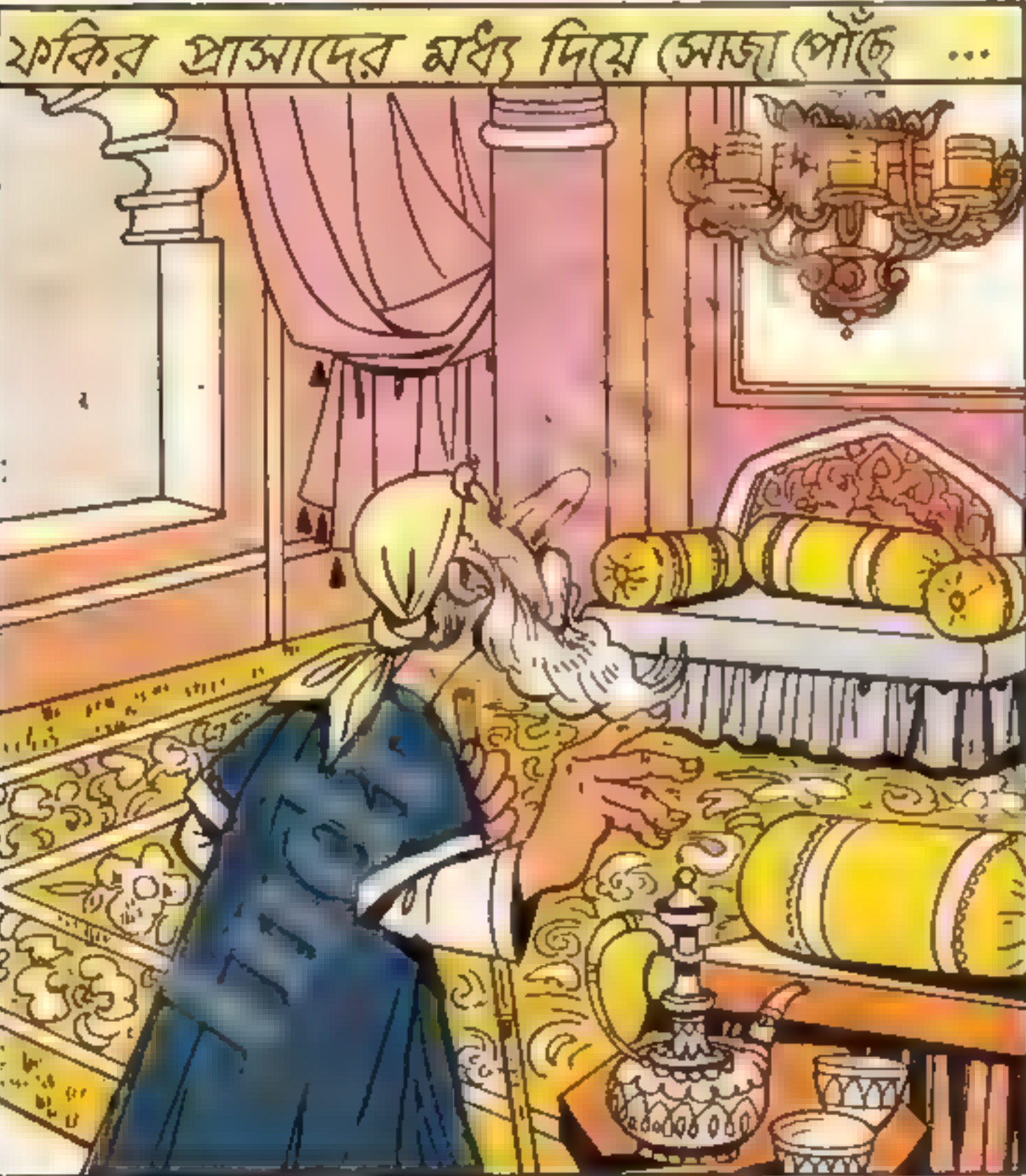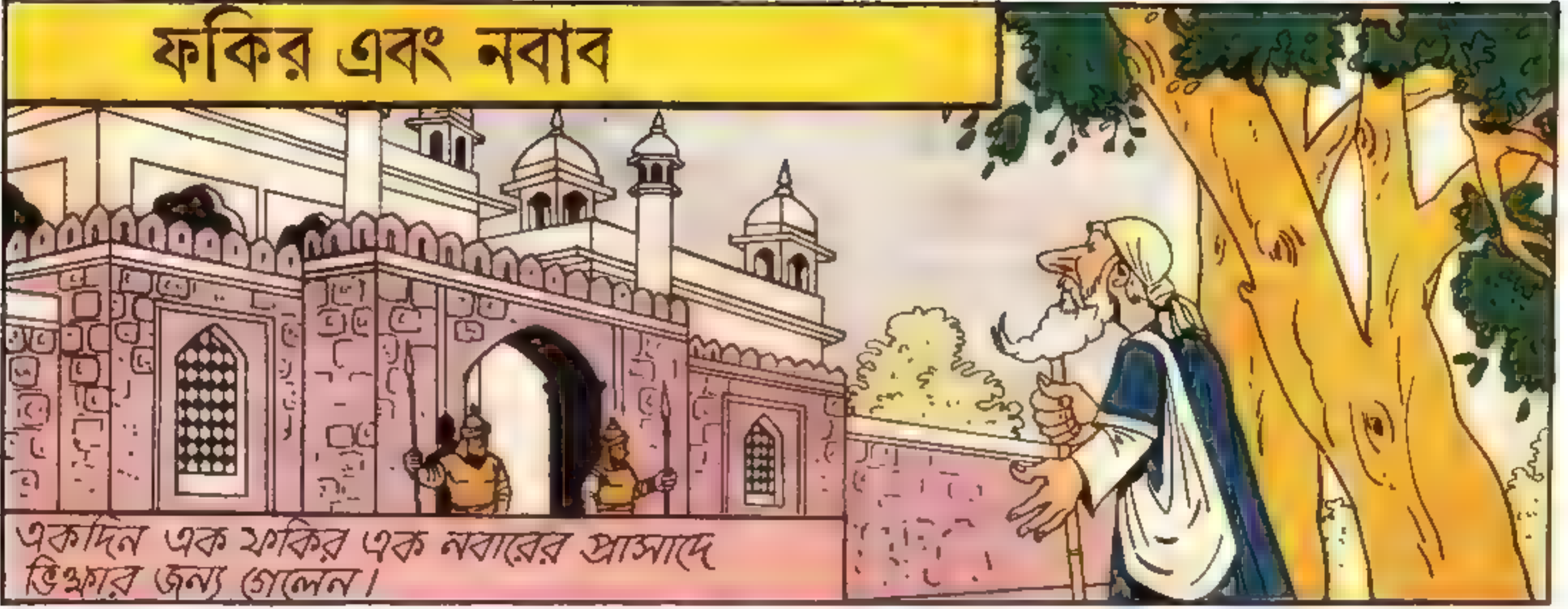
নবাব যথারীতি এই কথাগুলি উচ্চারন করে প্রার্থনা শেষ করলেন —
হে আল্লা, আমার প্রনতি গ্রহন করো। আমাকে অর্থ দাও, সম্পদ দাও, যশ দাও। আরও বিত্ত-শালী করো আমাকে...

হায়! হায়! আমি ভুল স্থানে এসেছি!

ফকির ফিরে যাচ্ছেন, নবাবের তা নজরে পড়লো।
দাঁড়ান ফকির বাবা। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কোনও কথা না বলে চলে যাচ্ছেন কেন?

আমি আপনার কাছে অর্থ চাইতে এসেছিলাম। দেখলাম, আপনিই বরং ঈশ্বরের কাছে আরও ধন ভিক্ষা চাইছেন। এজন্য আমি ফিরে যাচ্ছিলাম।

বলুন, ভিখারির কাছে কেন আমি ভিক্ষা চাইবো? চাইতে হলে ওপরওয়ালা খোদ খোদার কাছে চাইবো।

ব্রাহ্মণ এবং গরু
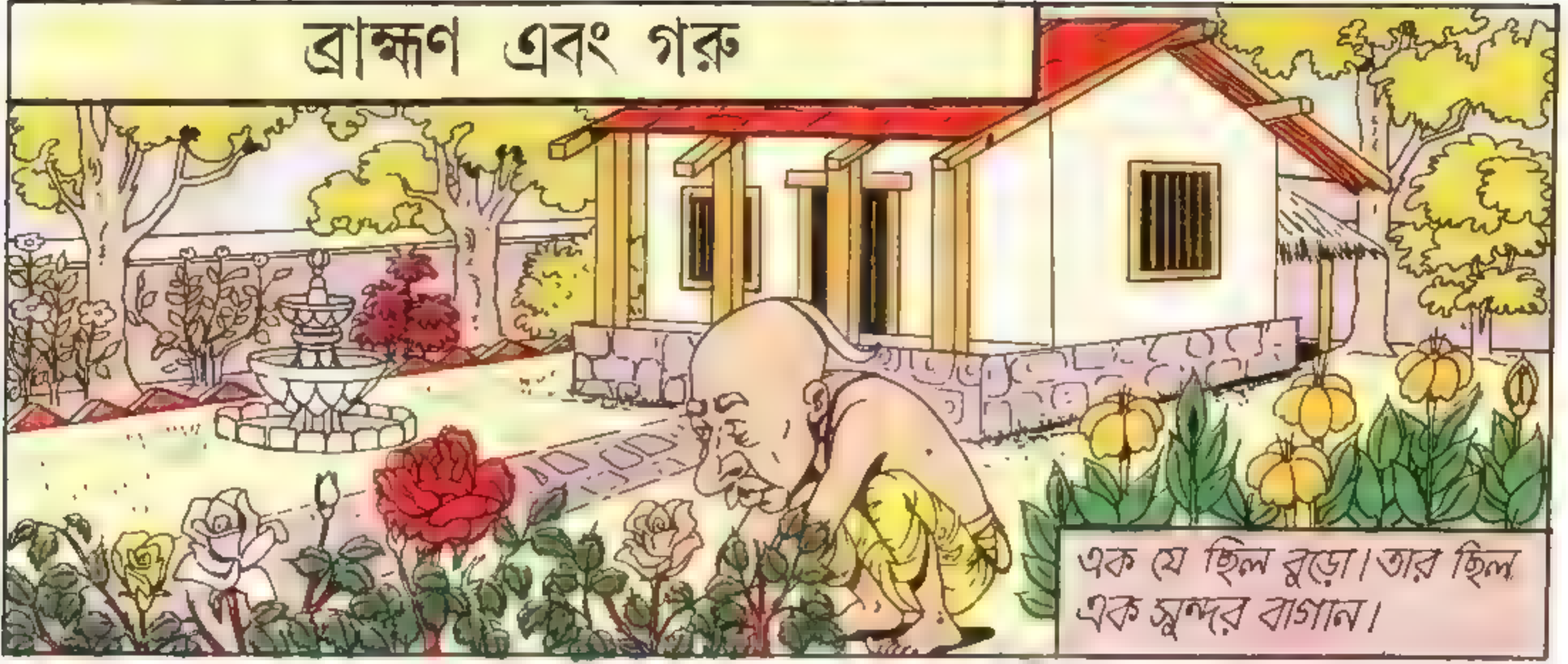
এক যে ছিল বুড়ো। তার ছিল এক সুন্দর বাগান।

বাগানটি ছিল বুড়োর প্রাণ। সে বেশির ভাগ সময়ই ব্যয় করতো বাগানের পিছনে।
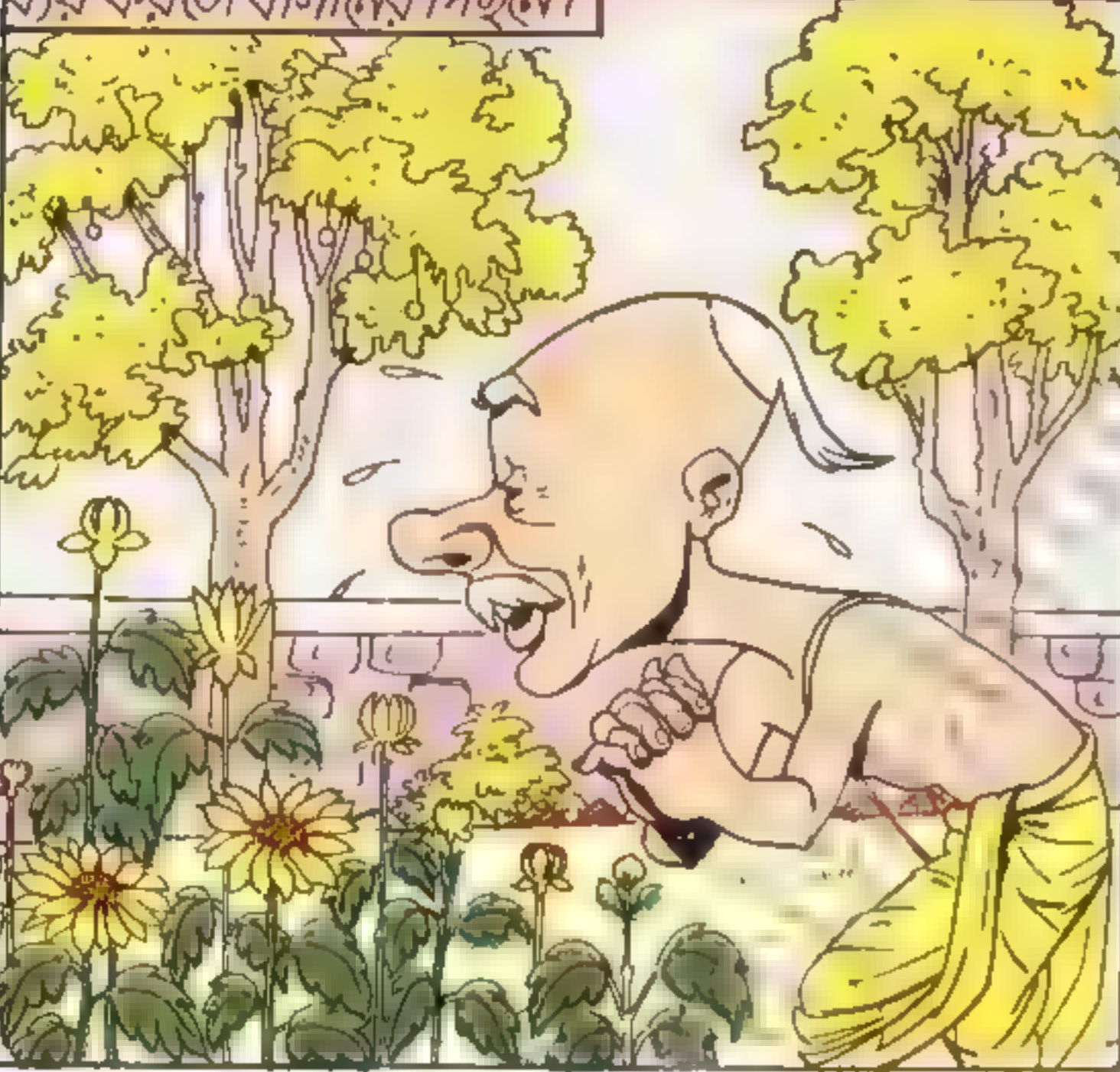
কিন্তু সে ছিল খুব স্বার্থপর। কাউকে সে এই বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিতে চাইতো না। এমন কি পাখিদের পর্যন্ত সহ্য করতে পারতো না।
বাগানে টিয়া ঢুকেছে। সূর্যমুখী ফুলগুলি নষ্ট করে দিলো। কী আপদ!

পালা, হতভাগা কোথাকার!

গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা বুড়োকে খুব জ্বালাতন করতো।
টিয়াপাখি সূর্যমুখীর রেণু খেতে খুব ভালোবাসে। আর আপনি বেচারাদের তাড়িয়ে দিলেন, দাদু?
দাদু, ব্রাহ্মণ হয়ে শেষকালে আপনার অতিথিদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেন?

অতিথি! না ছাই! পাজি পাখি!… আমি চাইনা যে আমার …

…বাগানের ধারে কাছে কেউ আসুক! ভাগ, তোরা, ছোঁড়ারা!

এই ভাবে দিন যায়। তারপর একদিন—
আমের চারাগুলি কতোখানি বাড়লো একবার দেখা যাক!

কোত্থেকে একটা ছাড়া গরু এসে আমের চারাগুলি শেষ করলো!

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ব্রাহ্মণ গরুটাকে লাঠি পেটা করতে লাগলো।
অপদার্থ, হতভাগা কোথাকার!

রুগ্ন, দুর্বল, বুড়ো গরুটা আঘাত সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লো...
... এবং মরে গেল।

সর্বনাশ! হায় ভগবান!! শেষপর্যন্ত গো-হত্যা করলাম!
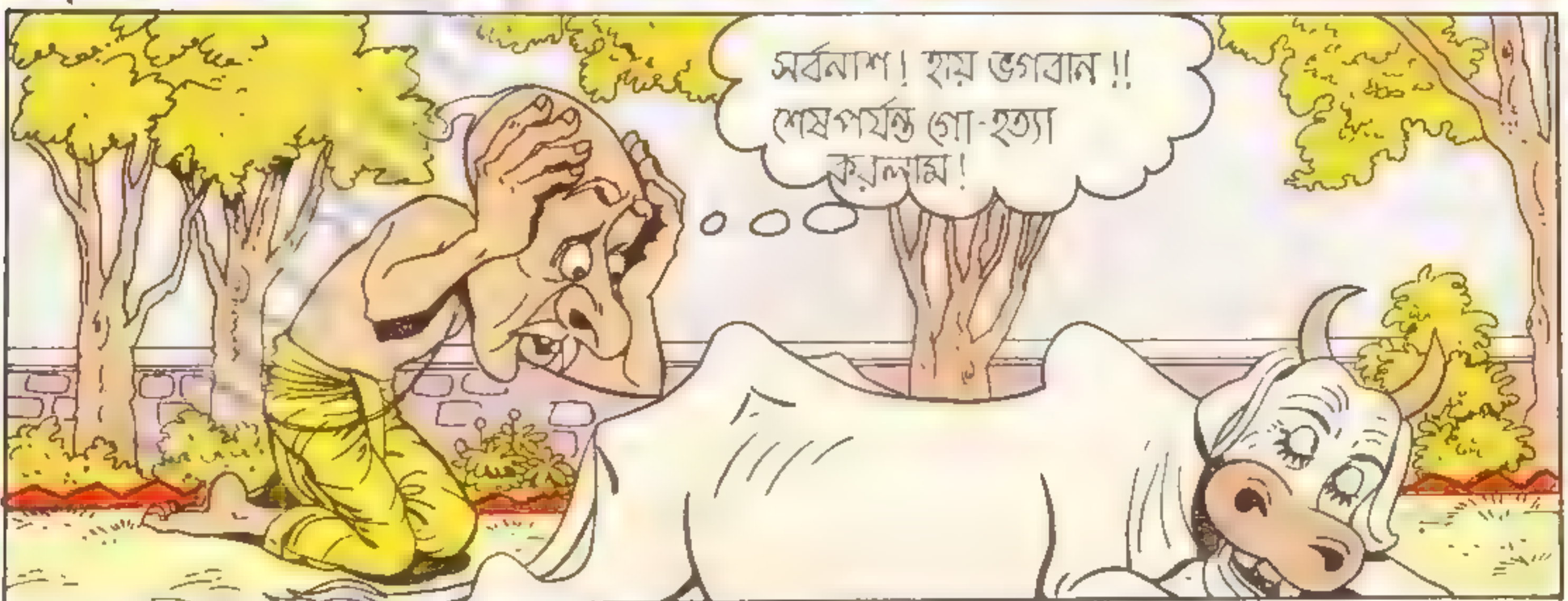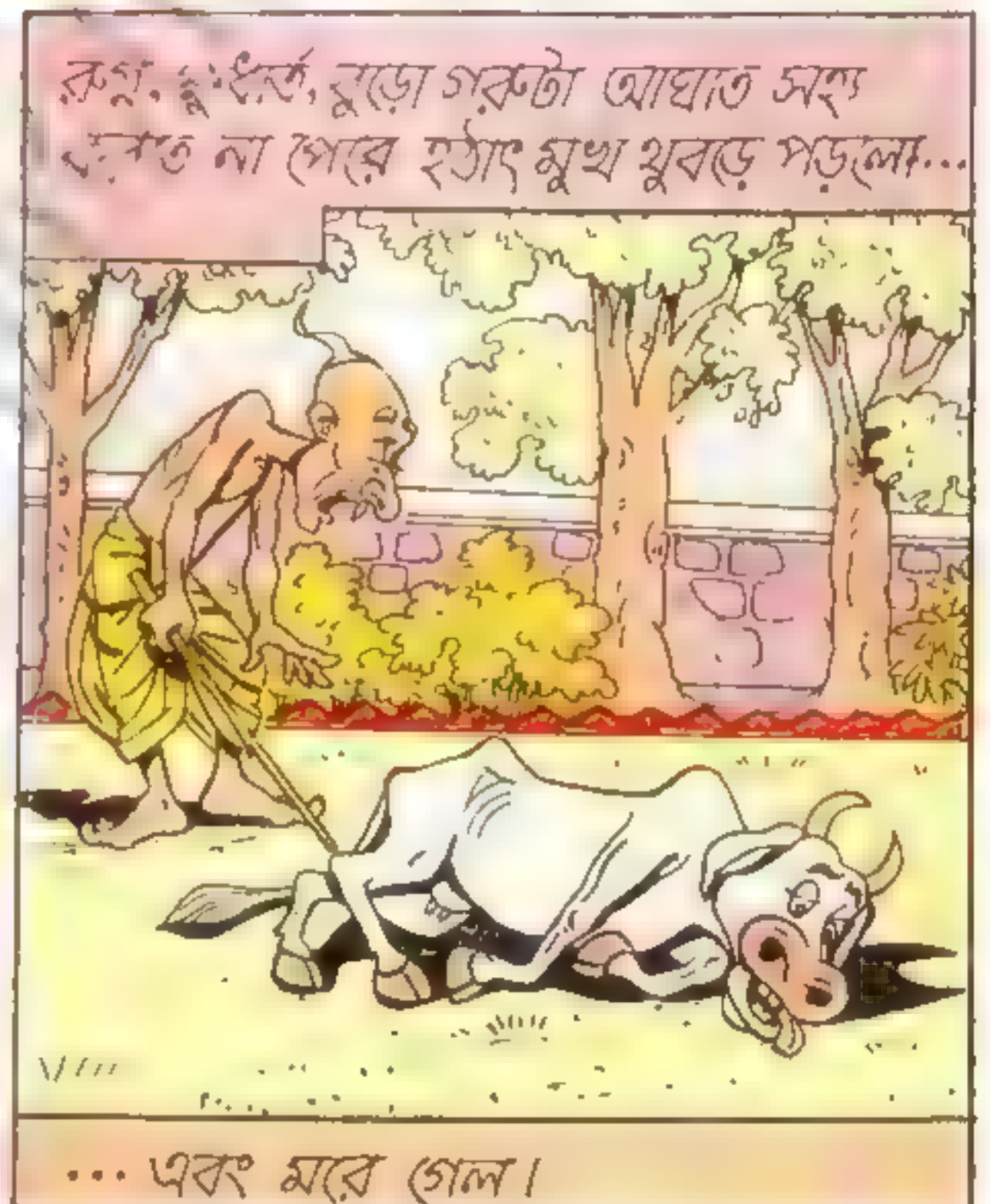
জানাজানি হতেই ব্রাহ্মণকে গ্রামবাসীদের মুখোমুখি হতে হলো।

মহাপাতকের কাজ করেছেন। একটা গরুর প্রানের চাইতে বাগানটা আপনার কাছে বড়ো হলো!

গরু আমাদের সুমিষ্ট দুধ দেয়। আর তাকেই কিনা মারলেন?
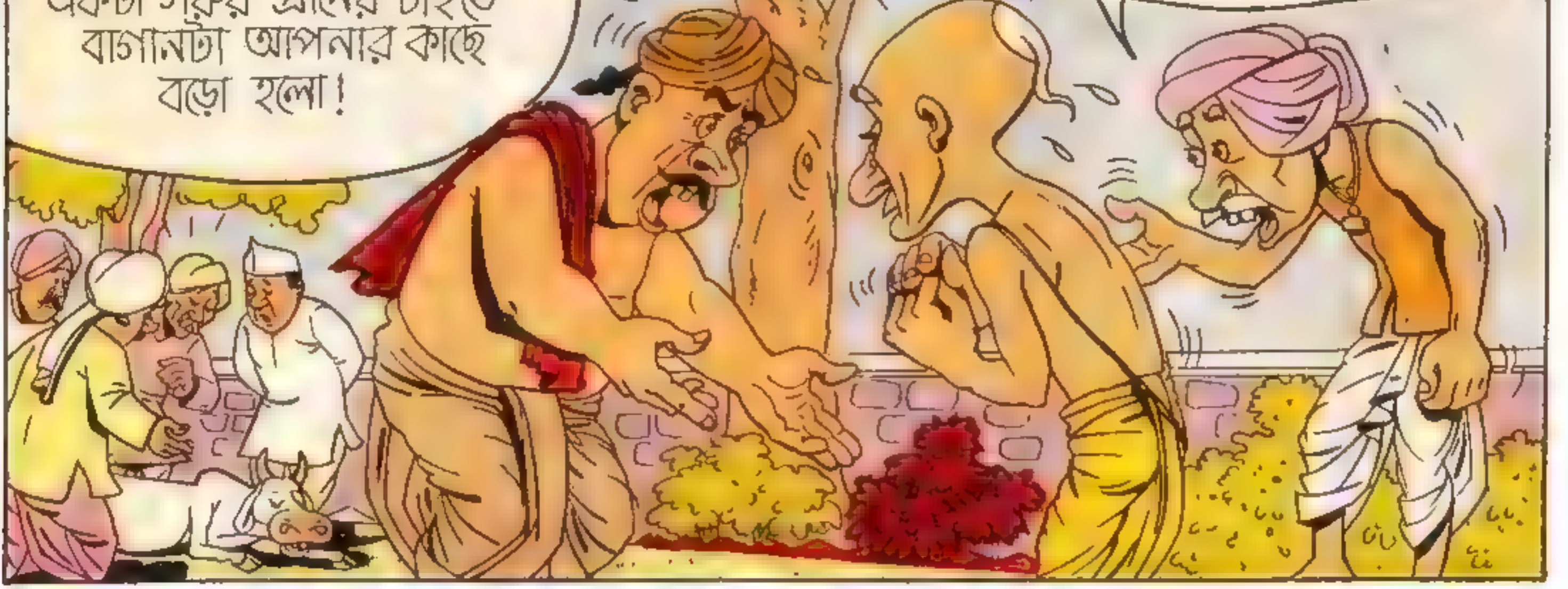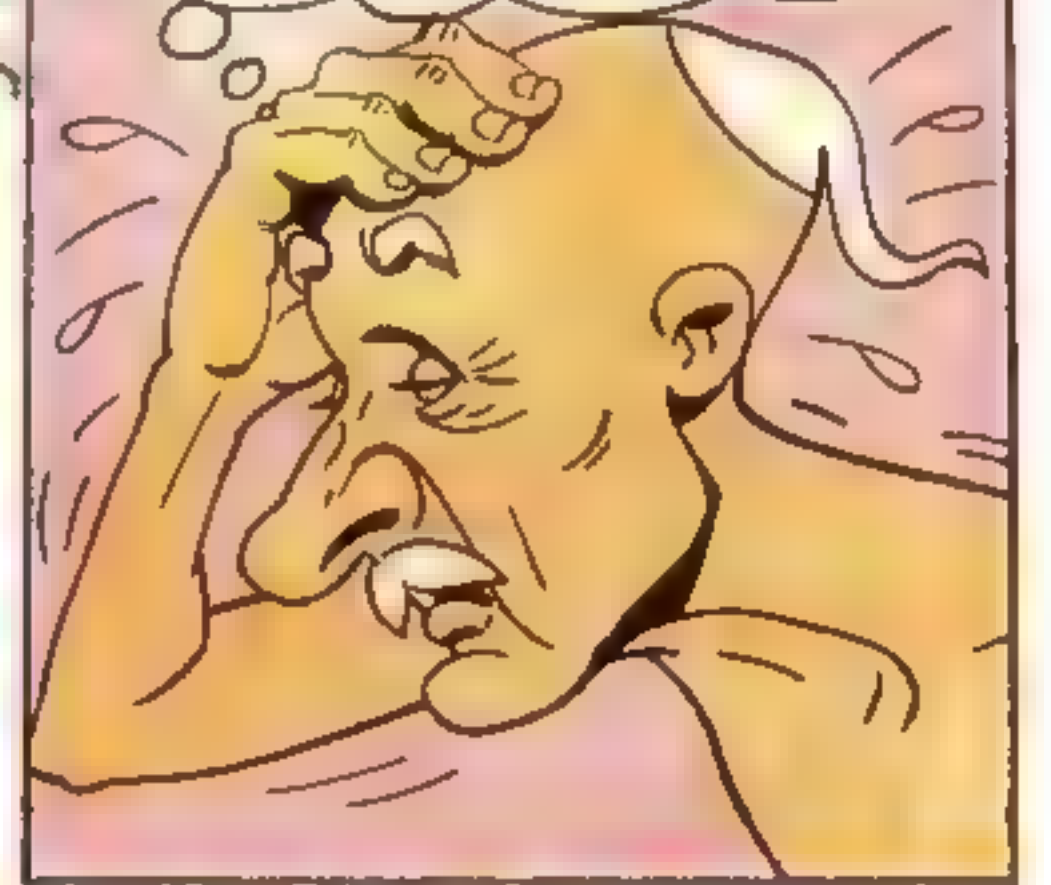
...তখন এই কর্মফলের জন্যে ইন্দ্রই সম্পূর্ণ দায়ী। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। ব্যাপারটা কাল গ্রামবাসীদের বলতে হবে!
পরের দিন, গ্রামের হাটে —
ঐ পাপ কাজ আমি করি নি। করেছেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি আমার হাত দিয়ে গো-হত্যা করিয়েছেন।
খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের কানে গেল সে কথা।
ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হবে!
এক বৃদ্ধের বেশে ইন্দ্র সোজা সেই ব্রাহ্মণের বাগানে এলেন।
মহাশয়, আমি এই গাঁয়ে নবাগত। এ পাশ দিয়ে যাবার সময় এমন সুন্দর বাগান দেখে না ঢুকে পারলাম না। কী চমৎকার!
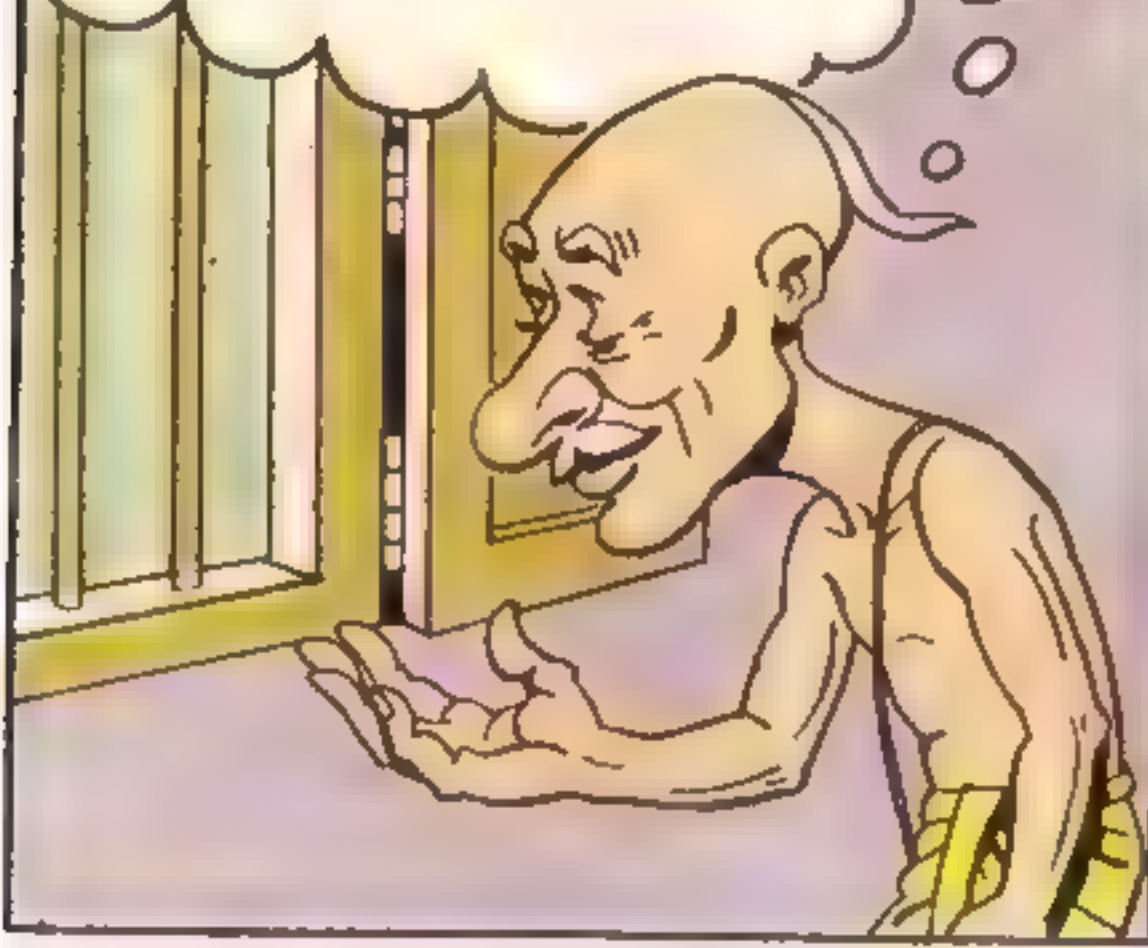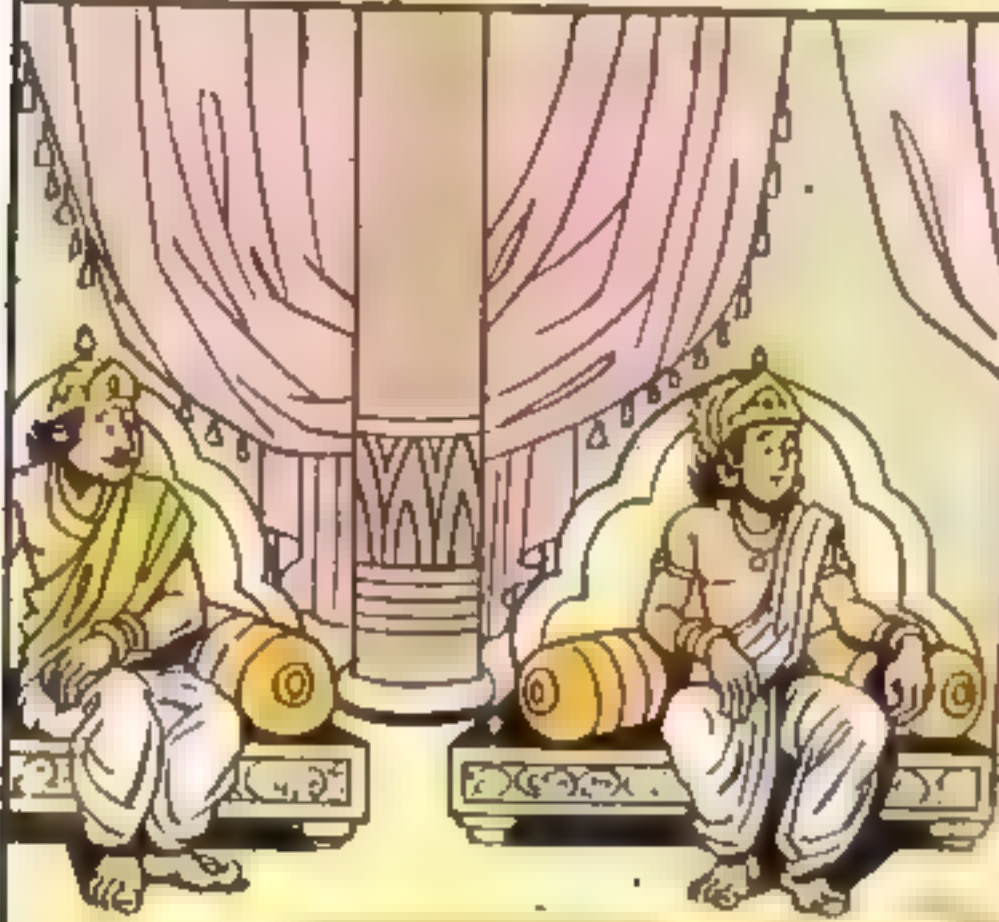
বাগানের প্রশংসায় ব্রাহ্মণ বিগলিত হলেন।
আজ্ঞে, এই বাগানকে আমি সন্তানের মতো নিজ হাতে লালন করেছি।

দেখে তো তাই মনে হয়। এই রাস্তাটিও দিব্যি খাসা। কে বানিয়েছেন এটি? আপনি?
আজ্ঞে, নিজে হাতে করেছি!

কী সুন্দর ফলের গাছ হয়েছে। আপনিই বুঝি পুঁতেছিলেন?
আজ্ঞে। বীজ থেকে ফল ধরা পর্যন্ত সব পরিচর্যা নিজের হাতেই করা।

কী চমৎকার ফোয়ারা। এটাও বুঝি আপনি নিজে বসিয়েছেন?
আজ্ঞে, সম্পূর্ণ নিজের হাতেই।

বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ইন্দ্র চকিতেই স্বমূর্তি ধারণ করলেন।
হে ব্রাহ্মণ, তোমার ঐ হাত দু'খানি যদি এই মনোরম উদ্যান রচনার সব কৃতিত্ব দাবী করতে পারে, তাহলে গো-হত্যার বেলায় নিজের অপরাধ অন্যের কাঁধে চাপাও কেন? ইন্দ্র বেচারী কি দোষ করেছেন?

THE MAGIC LAMP

YOUR ORDER, MY MASTER ?
BRING ME THE LATEST AMAR CHITRA KATHA.

HERE YOU ARE, MASTER.
OH! THANK YOU!

OH! I FORGOT. YOU MAY GO.

MAY I BORROW YOUR COPY OF A AMAR... CHIT.. CHIT... CHITRA KATHA FOR A WHILE?
!
THE SONS OF RAM

WHO DOES NOT LOVE TO READ AMAR CHITRA KATHA?

পণ্ডিত ও গোয়ালিনী
কোন এক সময়ে এক নদীর তীরে একজন পন্ডিত বাস করতেন। তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, নানা পন্ডিত তাঁর কাছে আসতেন আলোচনা করার জন্য।
অপূর্ব, পন্ডিতজী! এ কবিতার যে ব্যাখ্যা আপনি করেছেন, তার কোন তুলনাই হয় না।
সাধু! সাধু!
ধন্যবাদ, বন্ধুরা ধন্যবাদ!
সত্যিই পন্ডিতজী সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।
নদীর ওপারে লক্ষ্মী নামে এক গোয়ালিনী থাকতো। লক্ষ্মীই পন্ডিতের বাড়ি দুধ দিয়ে যেত।
সেদিন ভোর থেকেই তার কাজ ছিল অনেক। ঘুম থেকে উঠেই গোরুদের স্নান করানো ...
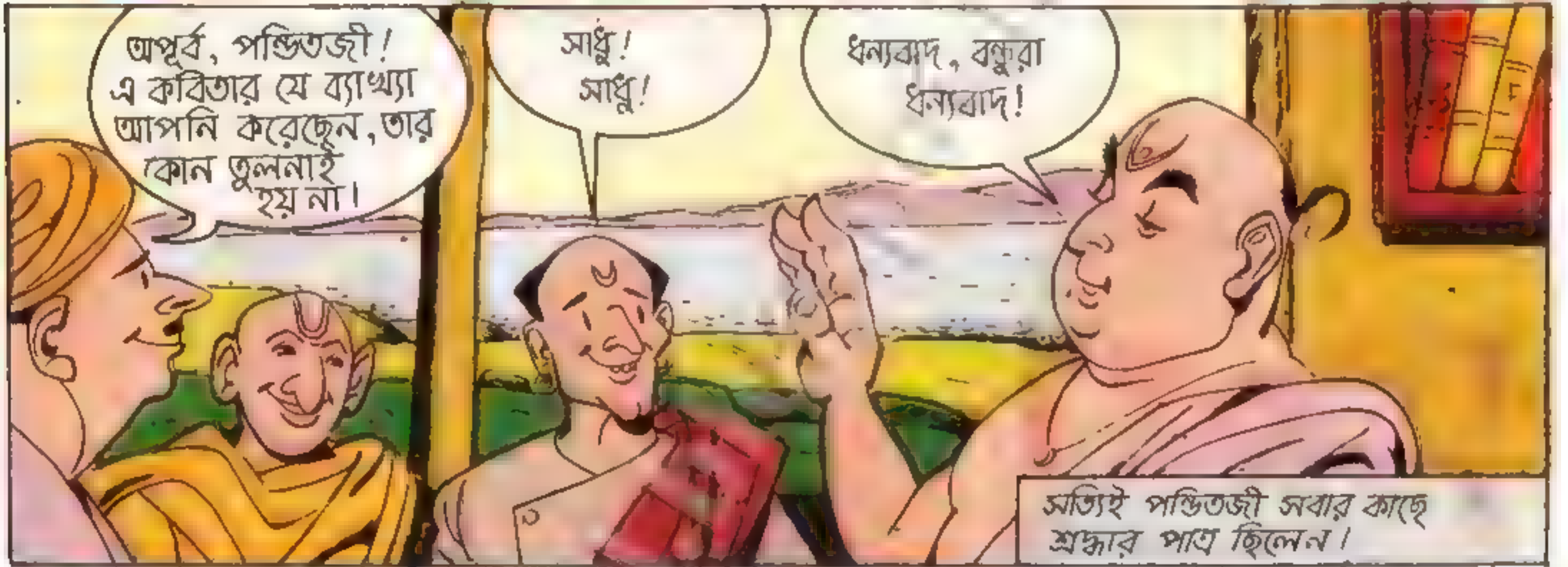
... তারপর দুধ দুইয়ে...

...বুড়ো বাবার জন্য সে খাবার তৈরি করল...

... এবার পন্ডিতের বাড়ি দুধ পৌঁছে দিতে হবে।
মাঝিকে পেলেই হয়!

নমস্কার পন্ডিতজী।
লক্ষ্মী নাকি! এসে গেছ তাহলে!

তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। শোনো বাছা, এখন থেকে দুধটা আরও ভোরের দিকে দিতে হবে।

কাল একদম সূর্য ওঠার আগেই আসা চাই।
ঠিক আছে, পন্ডিতজী!

পরদিন ভোরে —
মাঝি এখনো আসে নি দেখছি! এখানেই অপেক্ষা করি।

পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করল, কিন্তু মাঝি কোথায়?
হায় কপাল! সূর্য যে উঠে গেল! পন্ডিতজীকে কী জবাব দেব?

অবশেষে মাঝির দেখা মিলল —
জলদি, ও মাঝি ভাই, জলদি চলো!

পন্ডিতের বাড়িতে —
কি গো মেয়ে, দেরি করে ফেলেছ যে! কী হয়েছিল?
পন্ডিতজী, আমি অনেক ভোরে... ঐ মাঝিটা...
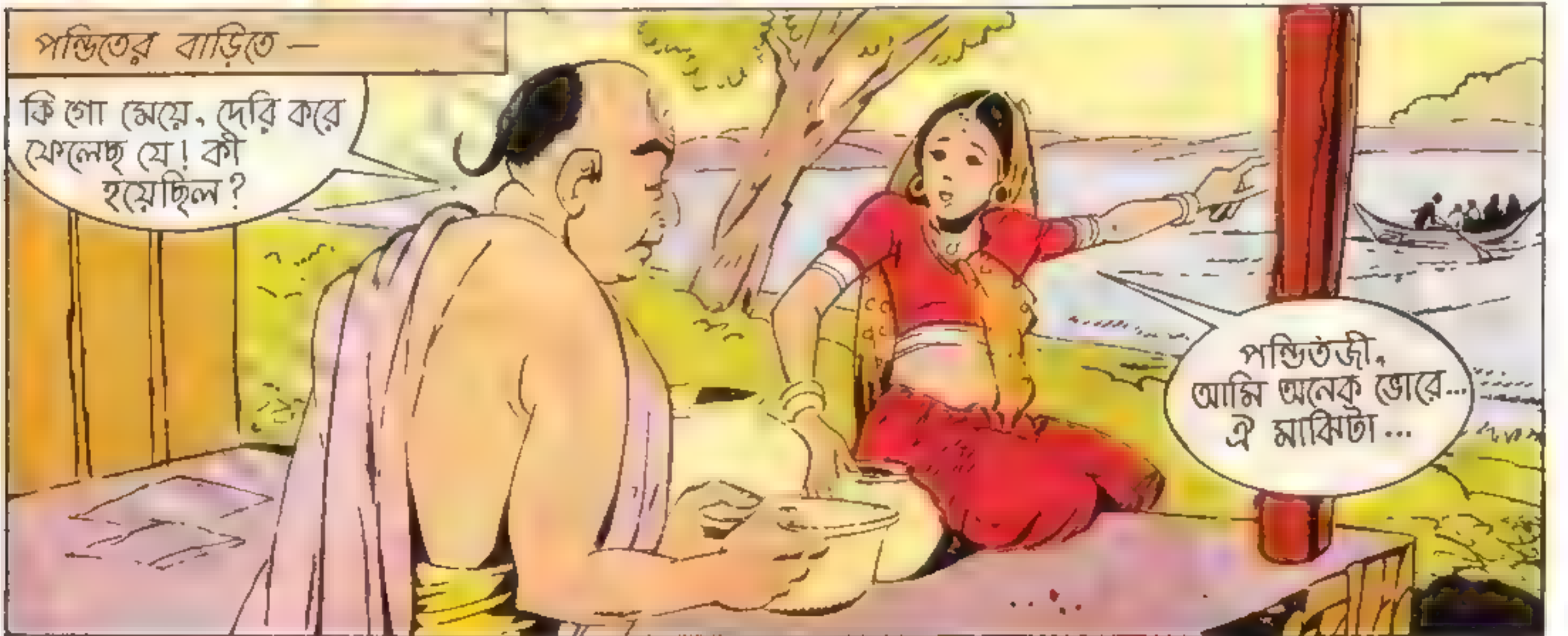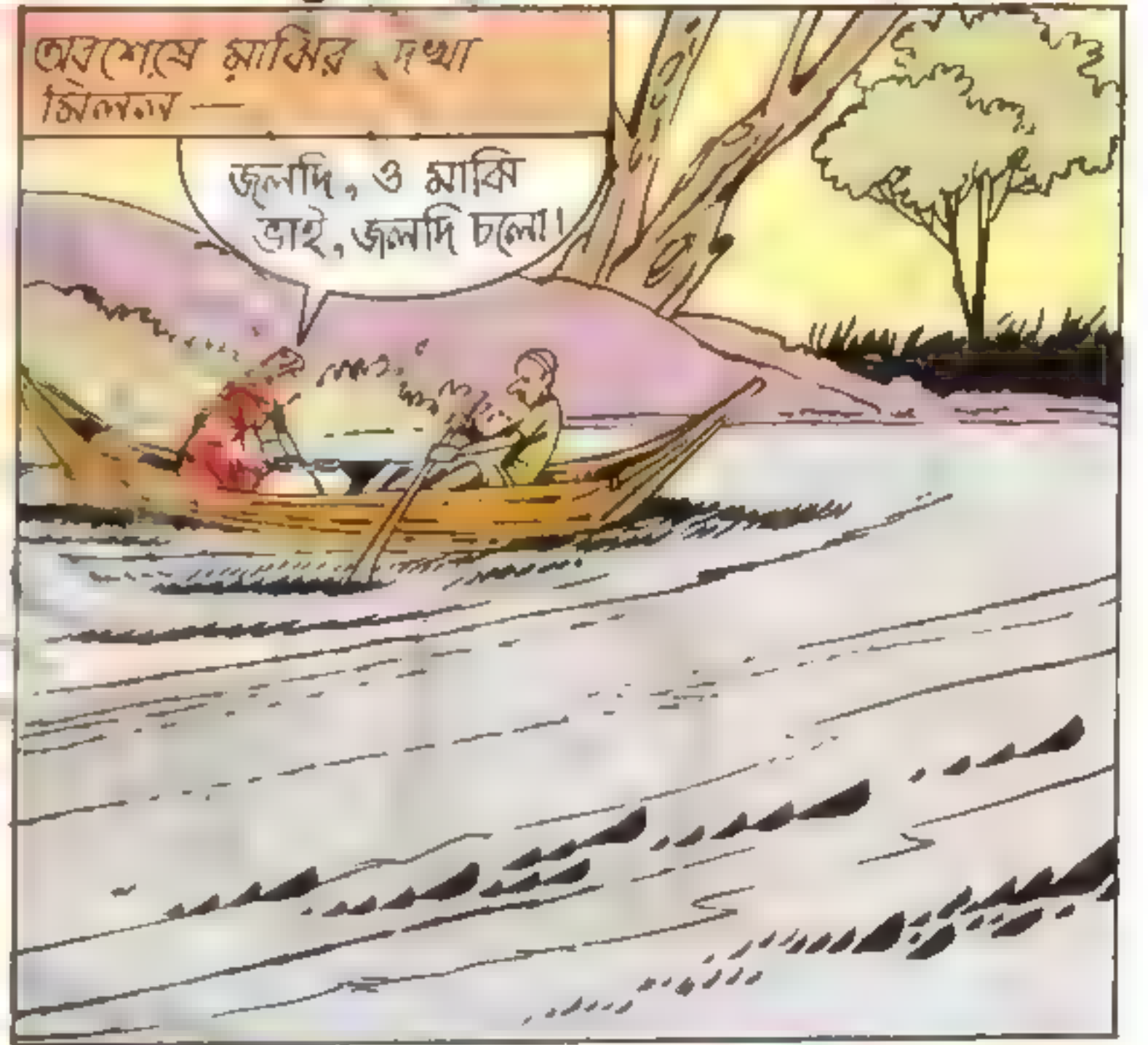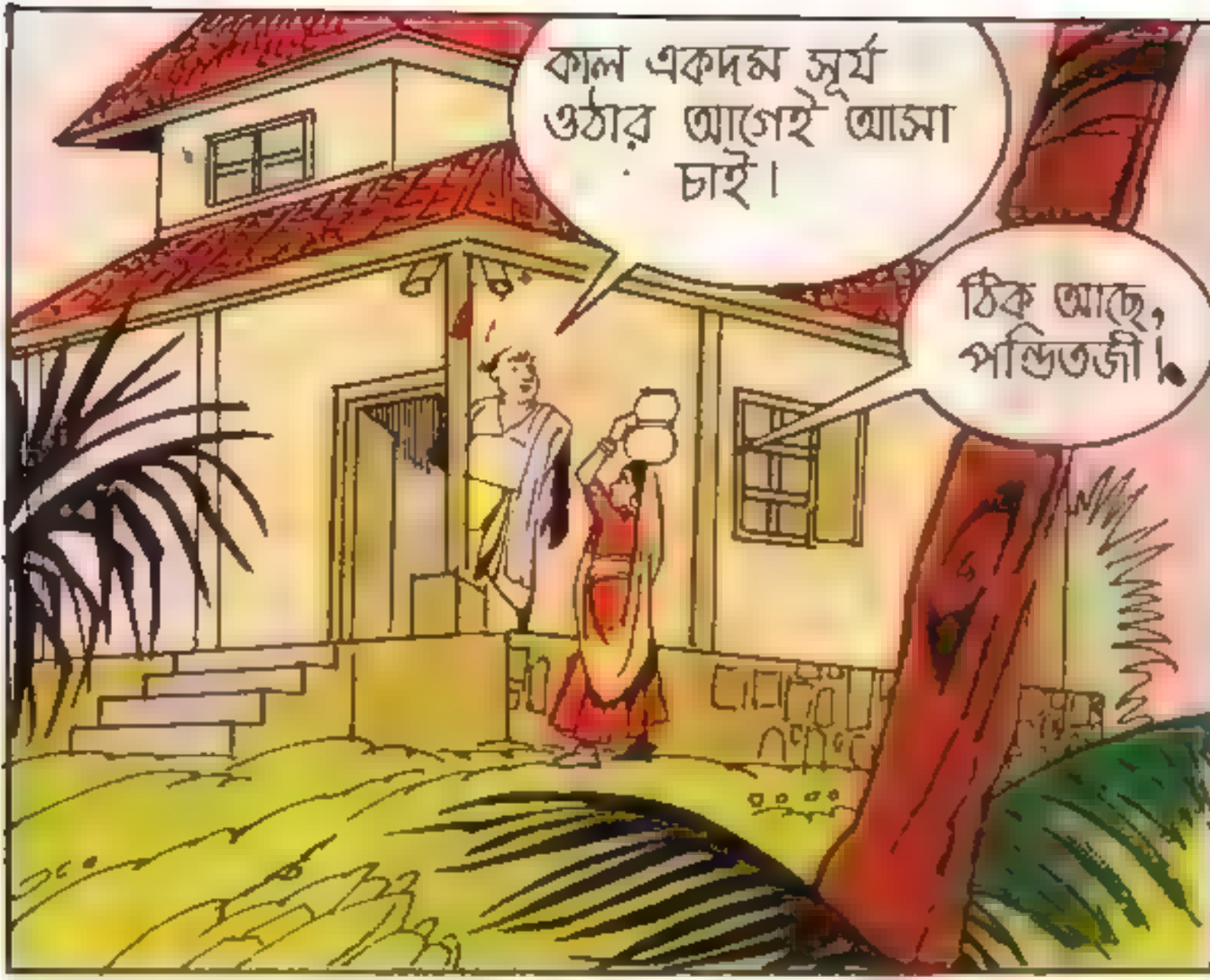
সেদিন পণ্ডিতের মেজাজটা বেশ খারাপ ছিল।
বাজে অজুহাত দেখিও না। তোমার সাহস তো কম নয়! আমার কথা অমান্য করলে? জানো না, আমি কে?
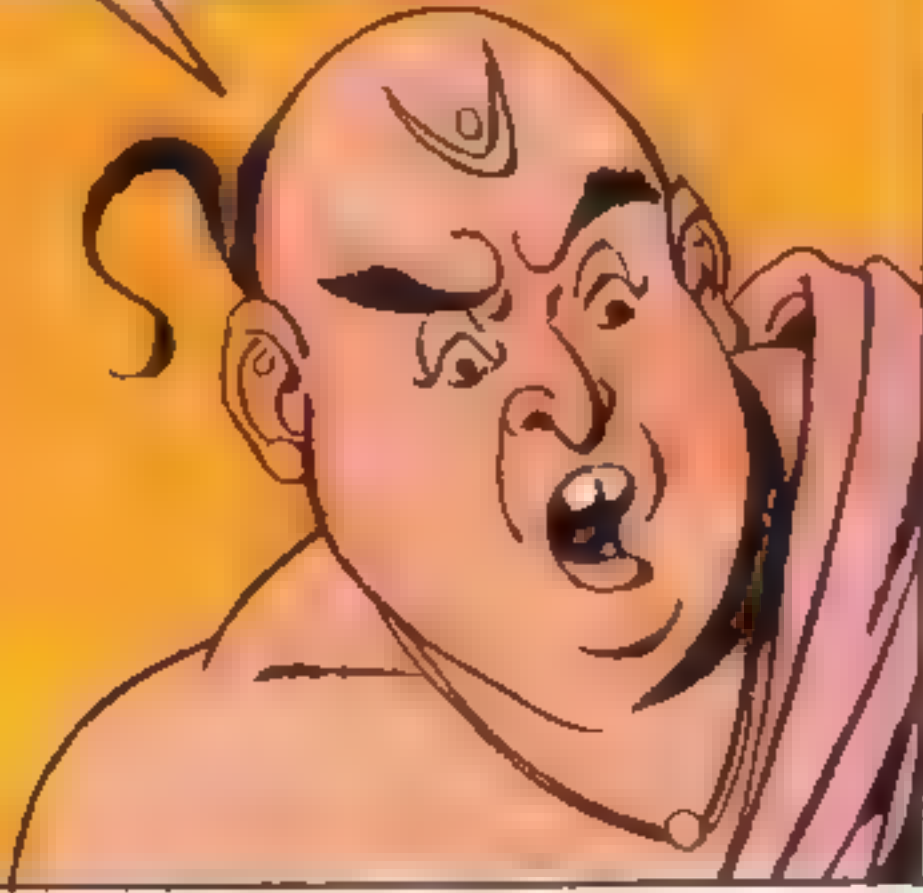
তুমি জানো, আমি কত লেখাপড়া করেছি? পণ্ডিতেরা আমায় কত শ্রদ্ধা করেন জানো? আর তুমি এক তুচ্ছ গোয়ালিনী, আমার কথায় কানই দিলে না?
আমাকে মাফ করে দিন.. পণ্ডিতজী...

হরি নামে লোকে জীবন সমুদ্রই পার হয়ে যায়। আর তুমি একটা সামান্য নদীও পার হতে পারলে না?
রাগের মাথায় পণ্ডিত নেহাতই কথার কথা বলেছিলেন।

...কিন্তু কথাগুলি লক্ষ্মীর মনে গভীর রেখাপাত করল।
ইস! পণ্ডিতজী যদি আগেই আমাকে এ কথা বলে দিতেন!

পরদিন—
দেখুন পণ্ডিতজী, আজ কত ভোরে চলে এসেছি।
খুব ভালো! কিন্তু... কোনো নৌকো তো দেখছি না' এলে কি করে?

কেন? আপনি যে ভাবে বলেছিলেন—
আমি বলেছিলাম? কী বলেছি, বলো তো?

পন্ডিতকে পথ দেখিয়ে লক্ষ্মী সোজা নদীতে এসে নামল।

হ্যাঁ... হ্যাঁ... হরি... হরি... হরি...
ধুতিটাকে একটু উঁচু করে ধরি...
'হরি' নাম নিয়ে চলে আসুন না!
আ আ আ আ...!
ওহো পণ্ডিতজী, আপনি মোটেই হরির কথা ভাবছিলেন না! ধুতিটার দিকে বার বার নজর দিচ্ছিলেন বলেই তো শুধু শুধু জলে পড়ে গেলেন।
ওওওও... ওফ্
লক্ষ্মী, নিজের পান্ডিত্য নিয়ে আমার কতই না গর্ব ছিল। কিন্তু আজ আমি একটা বড় শিক্ষা পেয়েছি। তোমার মতো সরল বিশ্বাসকেই ঈশ্বর মূল্য দেন। তুমি ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছ, লক্ষ্মী!
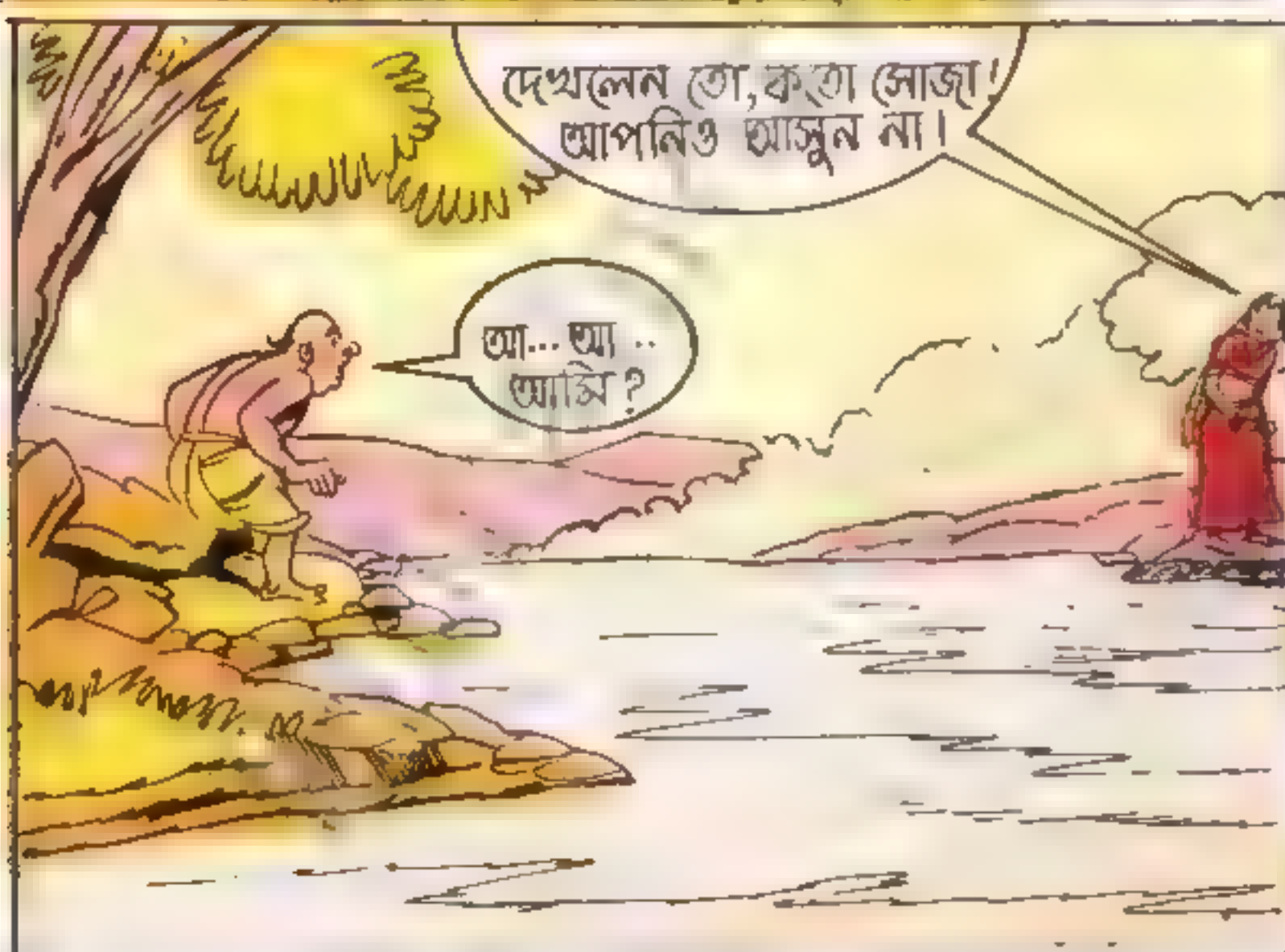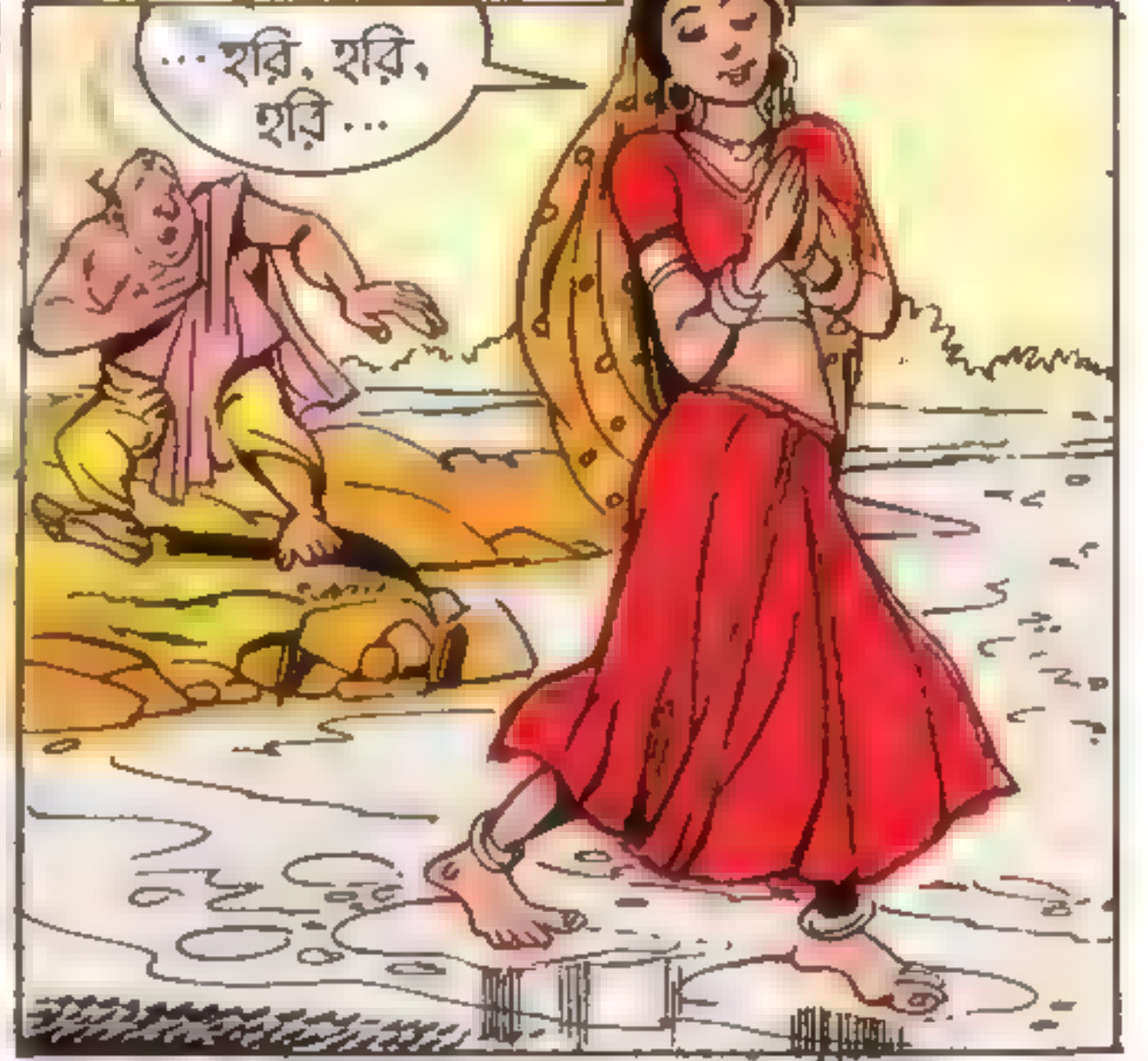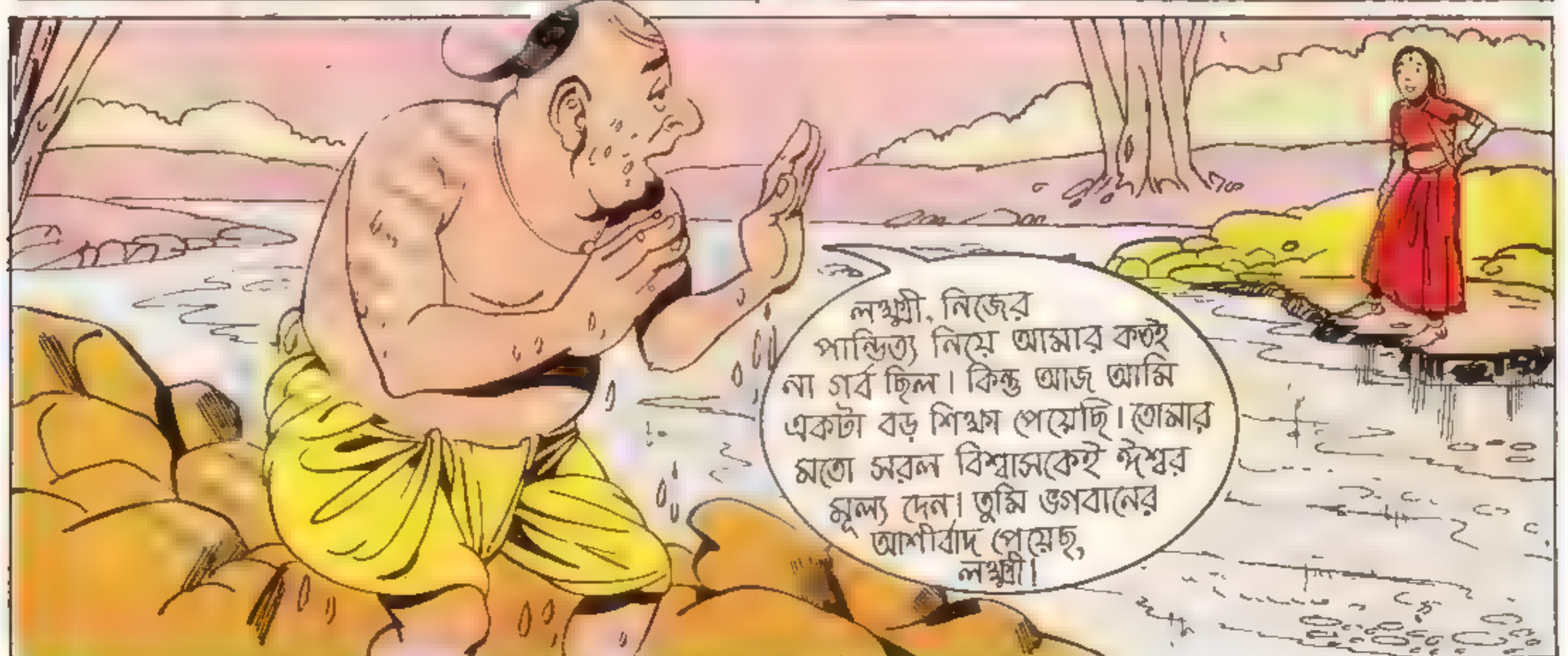
ঋষি ও গোখরো সাপ
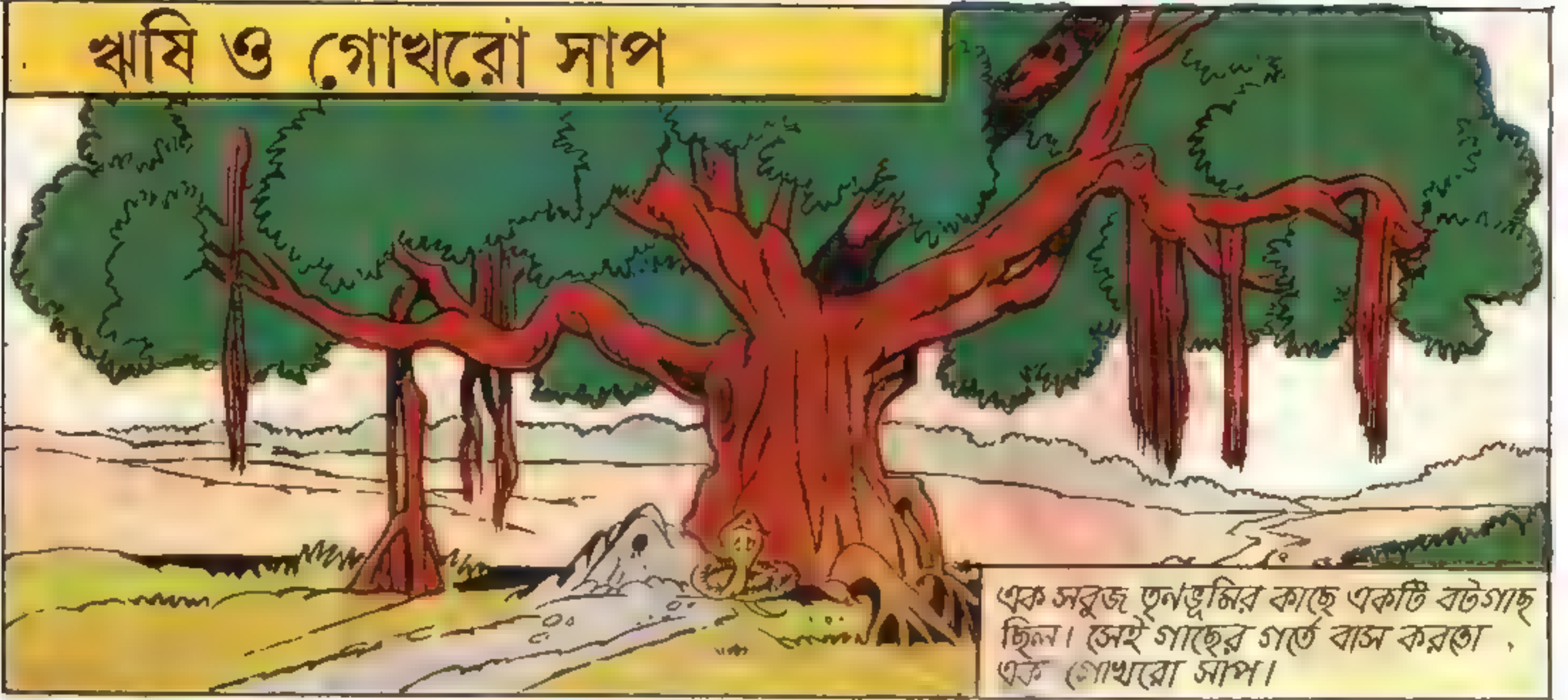
এক সবুজ তৃনভূমির কাছে একটি বটগাছ ছিল। সেই গাছের গর্তে বাস করতো এক গোখরো সাপ।

রাখাল ছেলেরা অনেক সময় সেখানে গোরু চরাতে আসত।
ঐ বটগাছটায় চড়তে কী ভীষন ইচ্ছে যে হয়!
আমারও তো! কিন্তু সাপের হাতে প্রান দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

একদিন এক ঋষি ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।
দাঁড়ান, দাঁড়ান, প্রভু!

ঐ পথ দিয়ে যেতে হলে খুব সাবধানে যাবেন। বটগাছটার গর্তে একটা হিংস্র গোখরো সাপ আছে।
পাজি সাপ অনেক লোককে কামড়েছে।

কিছু ভেবো না ছেলেরা। আমি এতে ভয় পাই নে। দুষ্টদের বশ করার একটা মন্ত্র আমি জানি।

ছেলেরা হাঁ করে দেখল ...

ঋষি ধীর পায়ে গাছের সামনে দিয়ে চললেন। পায়ের শব্দে গোখরো সাপটি ...

...ফণা তুলে তাঁকে ছোবল মারতে গেল।

ঋষি শান্ত ভাবে তাঁর হাতটি তুলে একটি মন্ত্র উচ্চারন করলেন।

তৎক্ষণাৎ সাপটি মাথা নুইয়ে ঋষির পায়ের কাছে নিরীহ একটা কেঁচোর মতোই শুয়ে পড়ল।

ওহে গোখরো, সমস্ত প্রাণীর অনিষ্ট করে তুমি কেন এমন হিংস্র জীবন কাটাচ্ছ? তুমি নিজেও তো ভগবানের জীব। তুমি কি চাও না সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসতে শিখতে?
আমি তাই চাই প্রভু। কিন্তু ভগবান সম্পর্কে আমি যে কিছুই জানি না।

আমি তোমাকে এমন মন্ত্র শিখিয়ে দেব যাতে তুমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবে।

ঋষি তাঁর মন্ত্রে গোখরো সাপটিকে দীক্ষিত করলেন।
দিনে কয়েকবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। মনে রেখো, কখনও কারও ক্ষতি করবে না। আমি আবার তোমাকে দেখতে আসব।
হে গুরুদেব, আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

দিন কাটতে লাগল।
বাপ্ রে! গোখরোটা! প্রাণে বাঁচতে চাস তো পালা...
দাঁড়া, দাঁড়া! কেমন শান্ত ভাবে শুয়ে রয়েছে, দেখেছিস! মরে গেল নাকি?

ছেলেদের একটু সাহস বাড়ল।
নারে, বেঁচে রয়েছে। একটু আগেই আমি ওটাকে নড়তে দেখেছি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে বোধহয়।
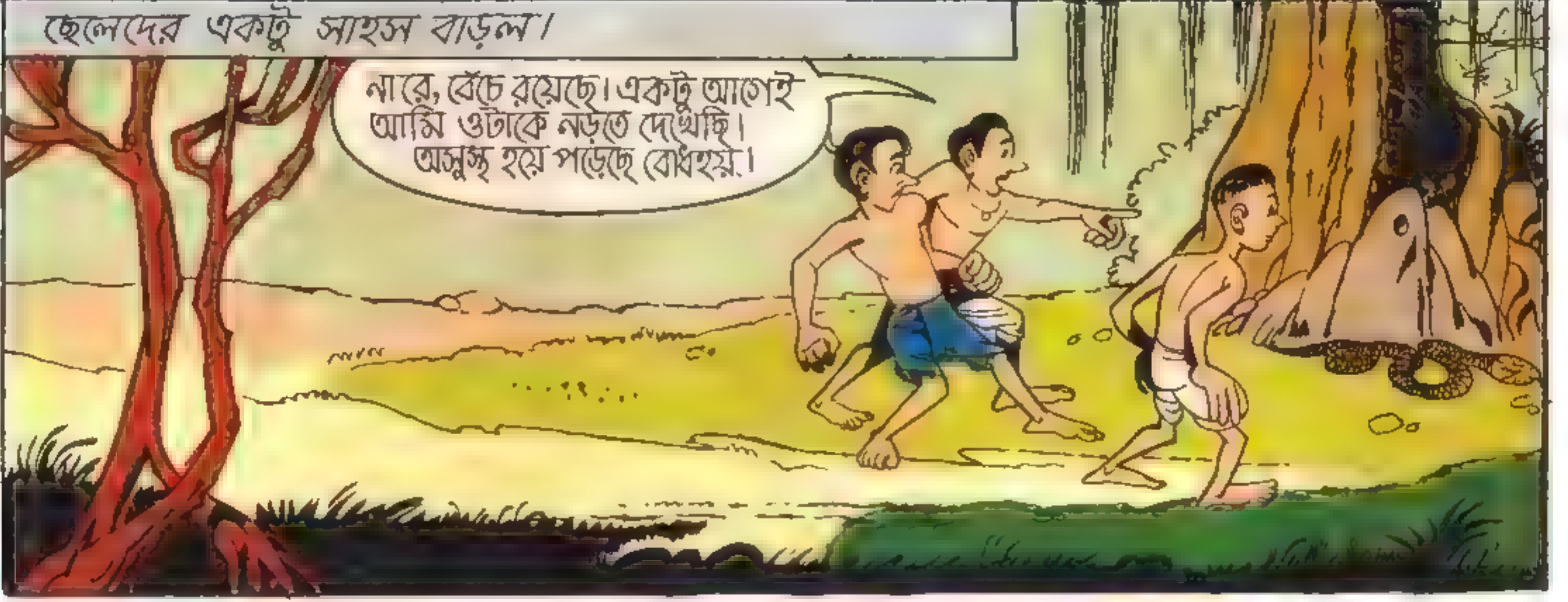
ছেলেরা সাপটার গায়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগল...

...কিন্তু সাপটা মড়ার মতো পড়েই রইল।
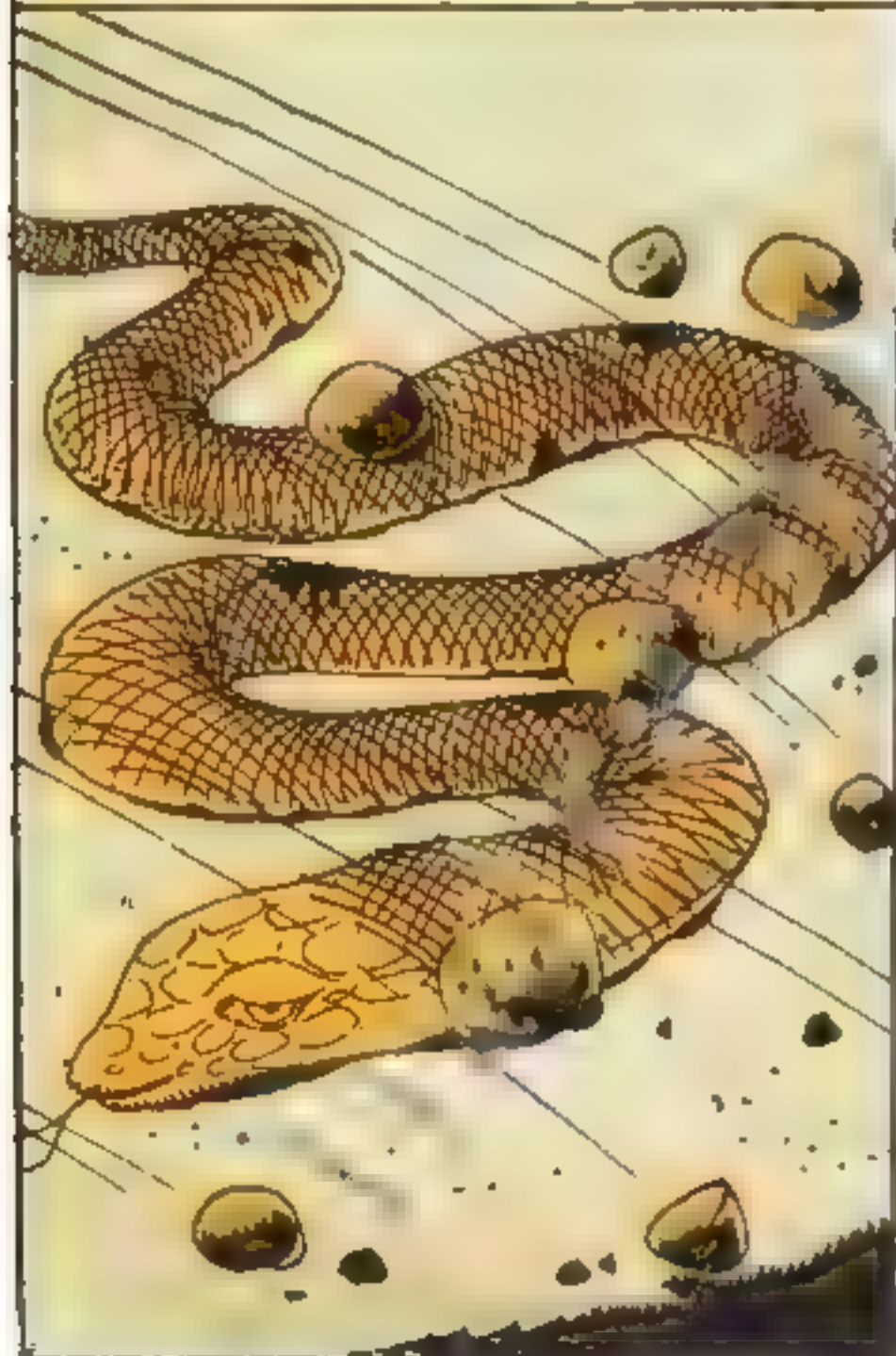
হঠাৎ একটা ছেলে দৌড়ে গিয়ে সাপটার লেজ চেপে ধরল ...
... আর মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে, খুব জোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল।

বেচারি সাপটা জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে রইল।

রাত্রি বেলায় আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরে এলো।
উঃ! কী ভীষন দুর্বল লাগছে! সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রনা...

বহুকষ্টে শরীরটাকে টেনে টেনে গর্তে নিয়ে এসে সাপটা কোন রকমে প্রান বাঁচাল।
একটা ইঁদুর যাচ্ছে। কিন্তু গুরুদেব বলেছেন কোন প্রানীর অনিষ্ট না করতে। শুকনো পাতা আর ফল খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

গোখরোটি শীগগিরই শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ল।

একদিন ঋষি তাঁর শিষ্যকে দেখতে এলেন। সাপটির দুরাবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন।
তোমাকে এমন শীর্ণ দেখাচ্ছে! তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে?

হে গুরুদেব, আপনি আমাকে কারো অনিষ্ট করতে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমি পাতা আর ফল খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম—এজন্যই বোধ হয় একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি।

267/BENG.

কিন্তু তোমার সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন… কে তোমাকে এমন ভাবে আঘাত করল ?

আমি… হ্যাঁ, হ্যাঁ… একটু একটু মনে পড়ছে… ঐ ছেলেগুলি… একেবারেই ছেলে-মানুষ কিনা, না বুঝেই এমন করেছে। আমার পরিবর্তনের কথা ওরা কিছুই জানে না।

তুমি রাগ জয় করেছ দেখে আমি সত্যিই খুশি। কিন্তু ছেলেদের তুমি মারতে দিলে কেন ?

আমি তোমাকে কামড়াতে বারন করেছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো বারন করিনি !

পুণ্যাত্মা
এক রাত্রে এক সাধু পথের ধারে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন ...

... এক চোর সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল।
পথের ধারে আবার কে শুয়ে আছে?

হুঁ... চোর না হয়েই যায় না!

নিশ্চয়ই পাশের গাঁয়ের কোনো বাড়িতে ডাকাতি করে সারাটা পথ প্রানের দায়ে দৌড়ে এসেছে। এখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

যে কোন মুহূর্তেই পুলিশ এসে পড়বে। তার আগেই সরে পড়া যাক!

সুতরাং সে ছুট্ লাগাল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই একটি লোক নেশায় টলতে টলতে একই জায়গায় এল। সাধুটিকে তারও চোখে পড়ল।
বেশ! বেশ! পথের মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছ, তুমি কে হে বাবা?
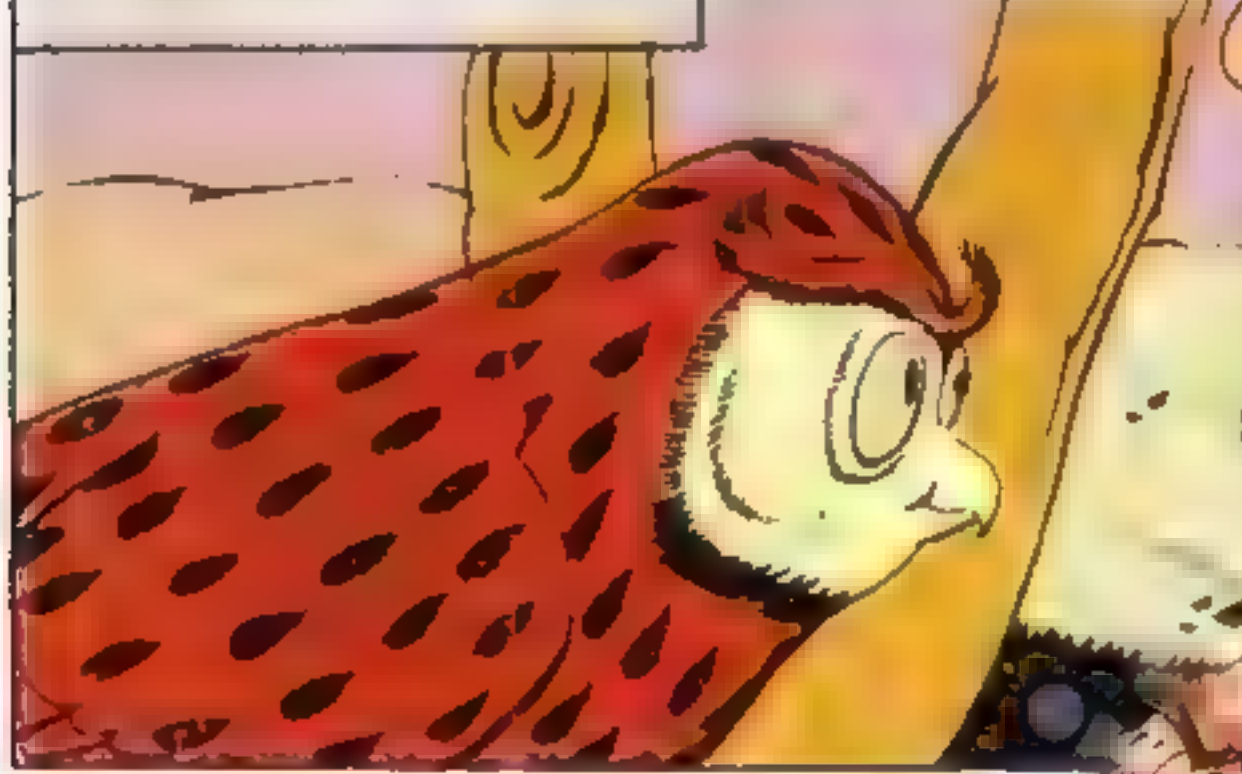
বুঝেছি! বন্ধু, তুমি একটু বেশিই টেনে ফেলেছ... একেবারে মুখ থুবড়ে খানায় পড়েছ!

কিন্তু আমি অত অল্পে বেঁহুশ হই না। তোমার মতো রাস্তায় গড়াগড়ি না খেয়ে দিব্যি কেমন হেঁটে যাব বহুদূর!
এও নিজের পথ ধরল।

কিছুক্ষণ পর আর একজন সাধু সেই পথে এলেন।

কে ইনি? এর মুখে গভীর প্রশান্তির ছাপ। জোড়া হাত দুটি দেখে মনে হচ্ছে প্রার্থনা করতে করতেই ইনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন। ইনি নিশ্চয়ই কোনো পুন্যাত্মা!
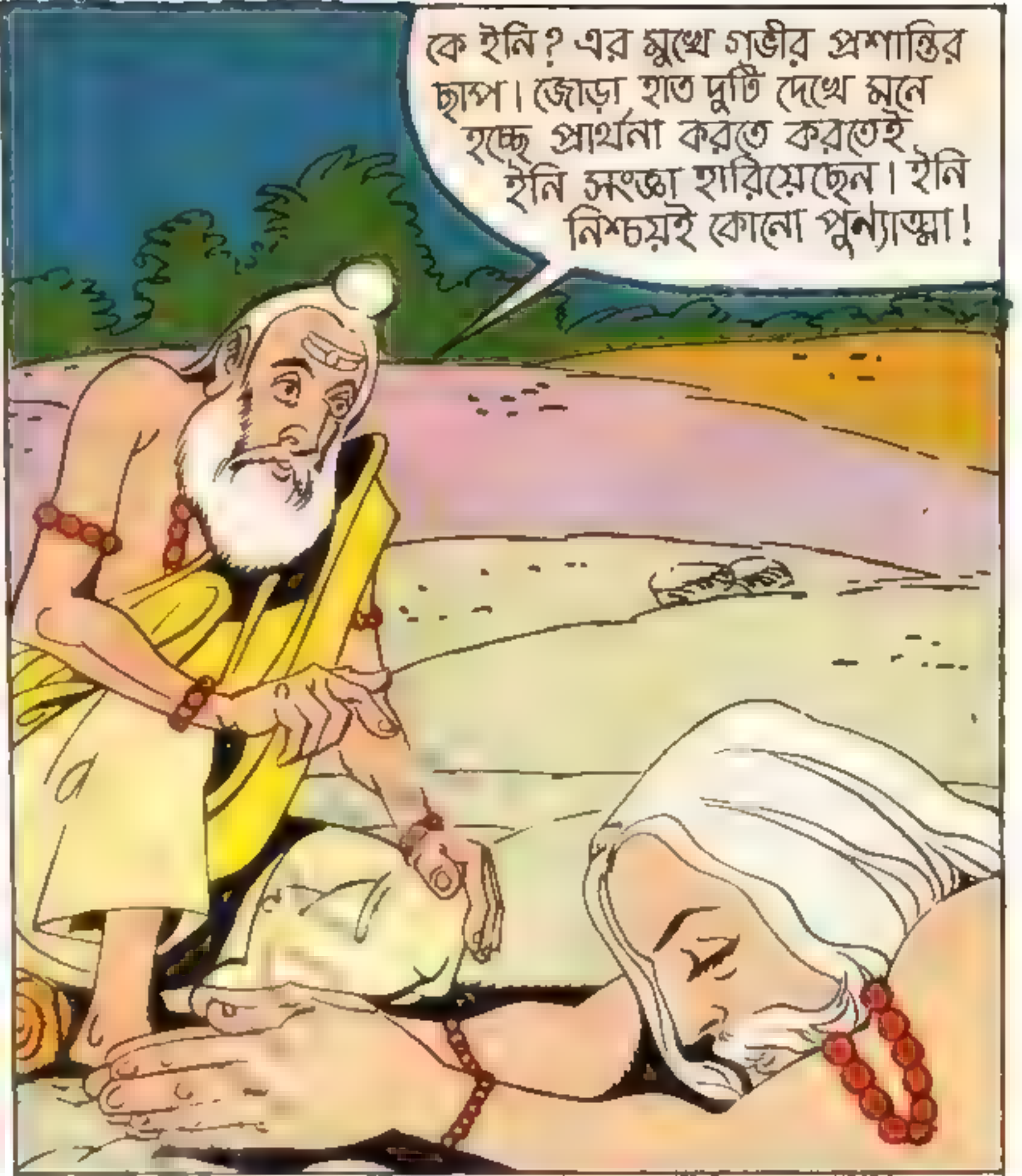
সাধুটি সেই পুন্যাত্মার পায়ে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন।
আপনার শরীর পথের ধুলোয় লুটোচ্ছে, কিন্তু আপনার নির্মল হৃদয় ঈশ্বর প্রেমে আপ্লুত। আপনি যথার্থ এক মহর্ষি!

ইনি নিজেও তাহলে তাই! আমরা তো নিজেদের দিয়েই অপরকে বিচার করি।
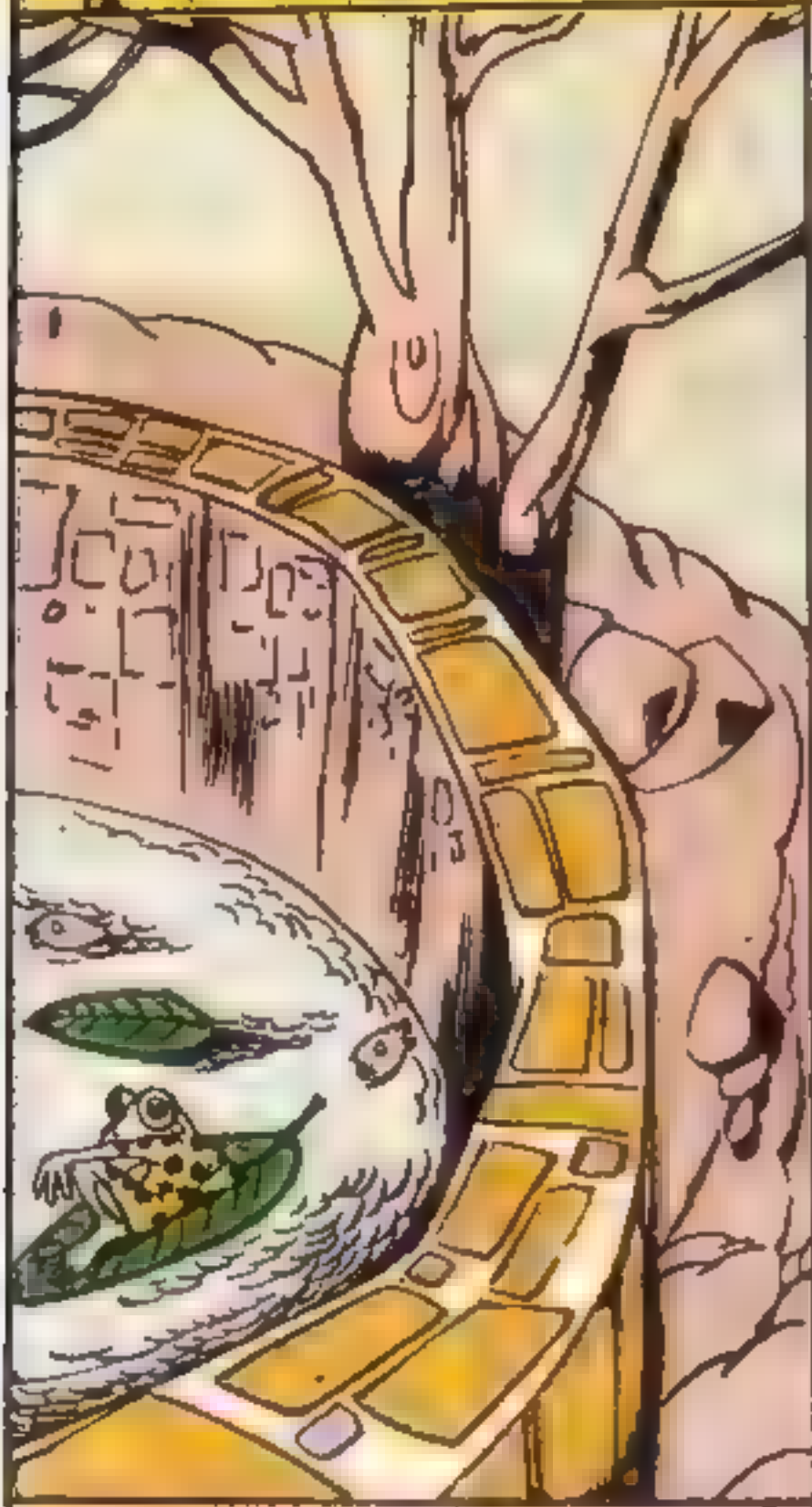
দুই ব্যাঙের গল্প
একটি কুয়োয় এক ব্যাঙ থাকত।

তার সারা জীবন কেটেছে এই কুয়োর মধ্যেই, সুতরাং বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

একদিন আর একটি ব্যাঙ হঠাৎ সেই কুয়োর মধ্যে এসে পড়ল।

স্বাগতম্! স্বাগতম! কোথা থেকে এলে?
নদী থেকে, বন্ধু!
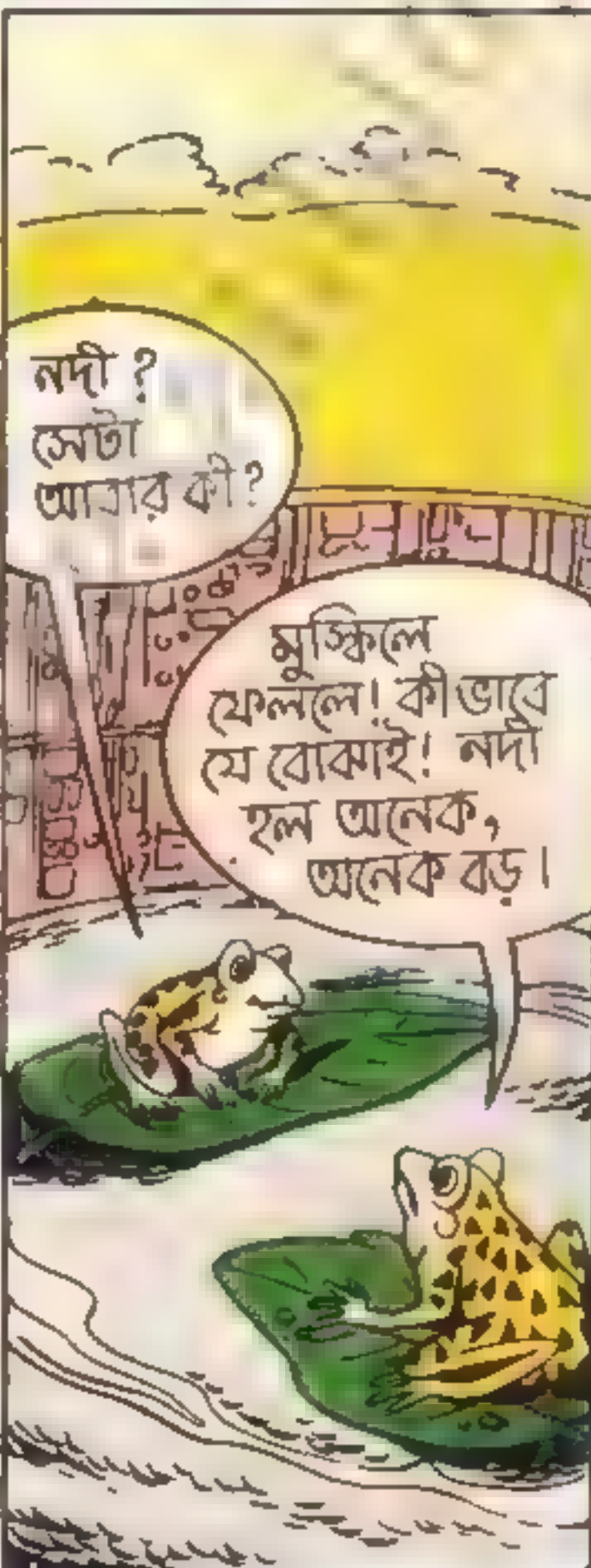
নদী? সেটা আবার কী?
মুস্কিলে ফেললে! কীভাবে যে বোঝাই! নদী হল অনেক, অনেক বড়।

অনেক বড়? এই-এতটা?
আরে না, না! এর চেয়ে ঢের বড়।
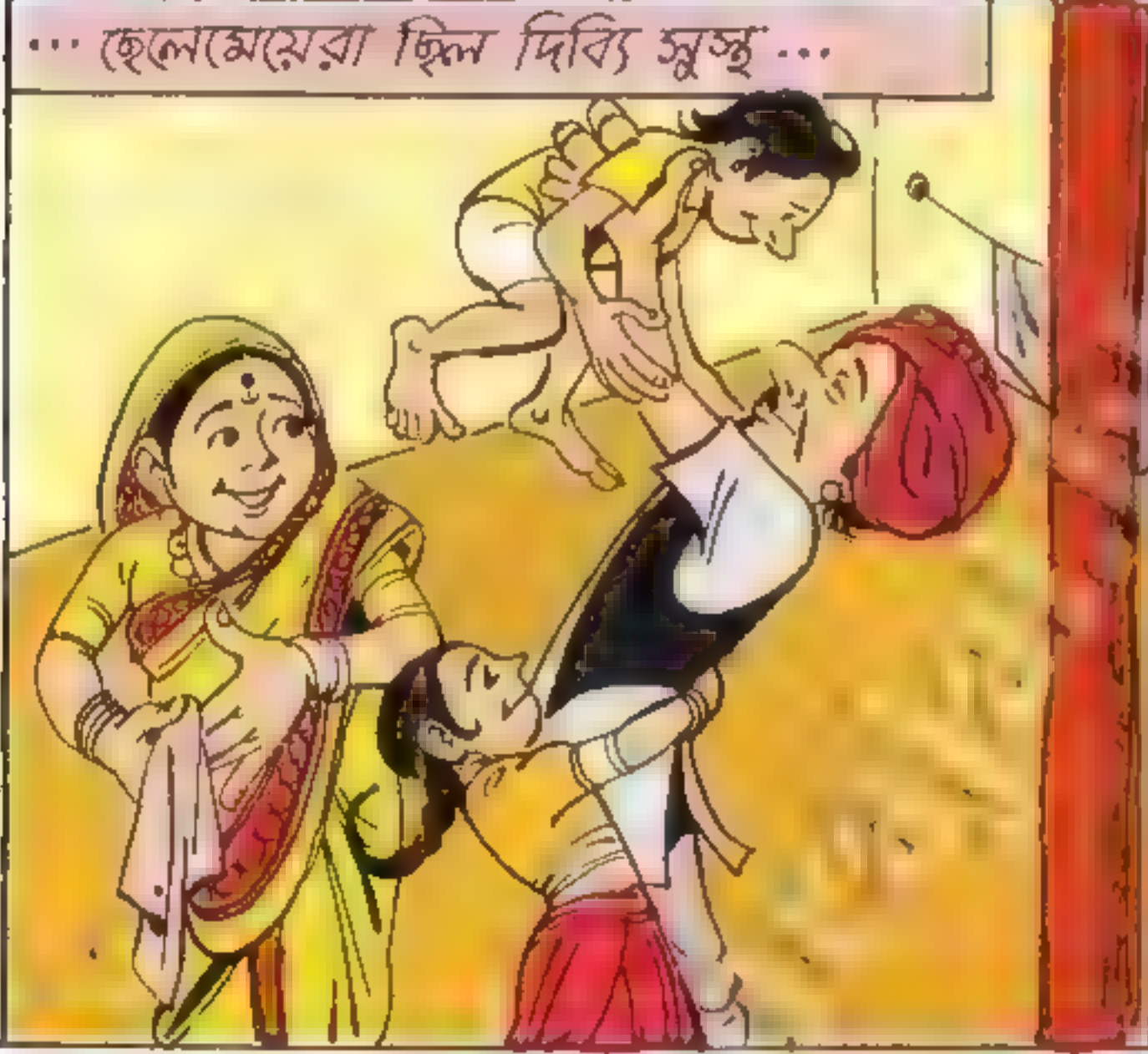
তাহলে সেটা কি...

আমার এই কুয়োর মতো বড়?
হাঃ! হাঃ! হাঃ!

হাসছো যে?
বন্ধু, নদীর সঙ্গে তোমার এই ছোট্ট গন্ডীর কোনো তুলনাই চলে না।

বাজে কথা বলো না। আমার এই কুয়োর থেকে কিছুই বড় হতে পারে না।

হয় তুমি নেহাতই মুর্খ, অথবা মিথ্যাবাদী! এখানে তোমার কোনো দরকার নেই, এক্ষুনি আমার কুয়ো থেকে বেরিয়ে যাও।
খুবই আনন্দের সঙ্গে, বন্ধু!

কে চায় বাইরের জগত সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকতে?

সাত ঘড়া সোনা

এক ছিল ক্ষৌরকার। ছোট্ট বাড়িতে বৌ আর ছেলে মেয়ে নিয়ে সে বেশ সুখেই বাস করছিল।

একদিন, সেখানকার রাজা ক্ষৌরকারকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন।

এবার থেকে আমার জন্য তোমাকে বহাল করা হল। প্রত্যেক মাসে তুমি এক থলি করে সোনার টাকা পাবে। এতে চলবে তো?

চলবে কি বলছেন রাজামশাই। এতো আমার স্বপ্নের অতীত! মহারাজ আপনি সাক্ষাত ভগবান!

আনন্দে নাচতে নাচতে ক্ষৌরকার ঘরে ফিরল।

আরে শুনেছ? রাজা মশাই নিজেই আমাকে বহাল করেছেন। আমাদের আর পায় কে?

আমি এক যক্ষ — এই গাছেই থাকি। আমি তোমাকে সাত ঘড়া সোনা দিতে চাই। নেবে?

প্রথমে ক্ষৌরকার একটু ইতস্তত: করল। পরক্ষণেই—
সাত ঘড়া সোনা? হ্যাঁ! হ্যাঁ! অবশ্যই নেব! সানন্দে!
তাহলে এখুনি বাড়ি চলে যাও। গিয়েই পেয়ে যাবে।

প্রবল উত্তেজনা ক্ষৌরকারকে প্রায় উড়িয়েই তার বাড়িতে নিয়ে এল।

আর তার চোখের সামনে সত্যিই সাতটা ঘড়া!
বাব্বাঃ! এসে গেছ! হঠাৎ ভোজ-বাজীর মত কতগুলি ঘড়া এখানে এসে হাজির হয়েছে। কে আনল গো এগুলি?

আমার বন্ধু দিয়েছে। শিগ্গীর দেখা যাক, ভেতরে কী আছে!

সোনা!

কর্তা-গিন্নী একে একে সব কটা ঘড়া পরখ করে দেখল।
সাত ঘড়া সোনা! একেবারে কানায় কানায় ভর্তি!
না গো! শেষটা দেখছি একটুখানি খালি।

সে কি! কিন্তু যক্ষটা ... মানে আমার বন্ধু যে বলল ...
তাতে আর কী যায় আসে?

অবশ্যই যায় আসে। যা টাকাকড়ি আছে, সব নিয়ে এস।
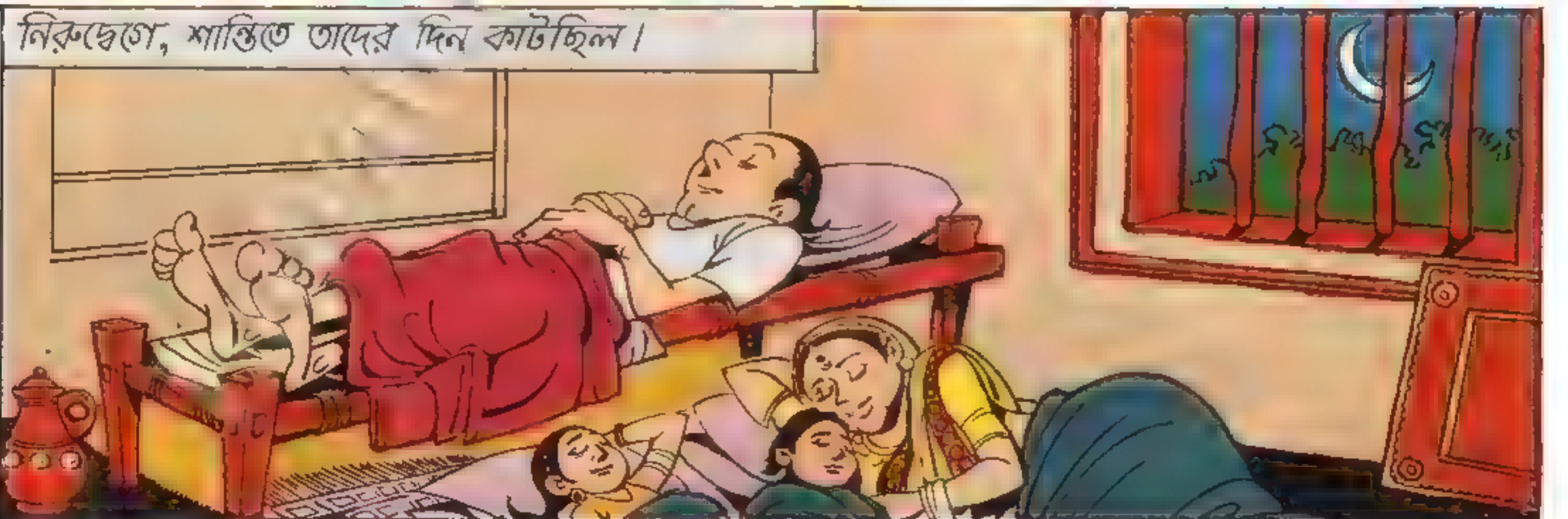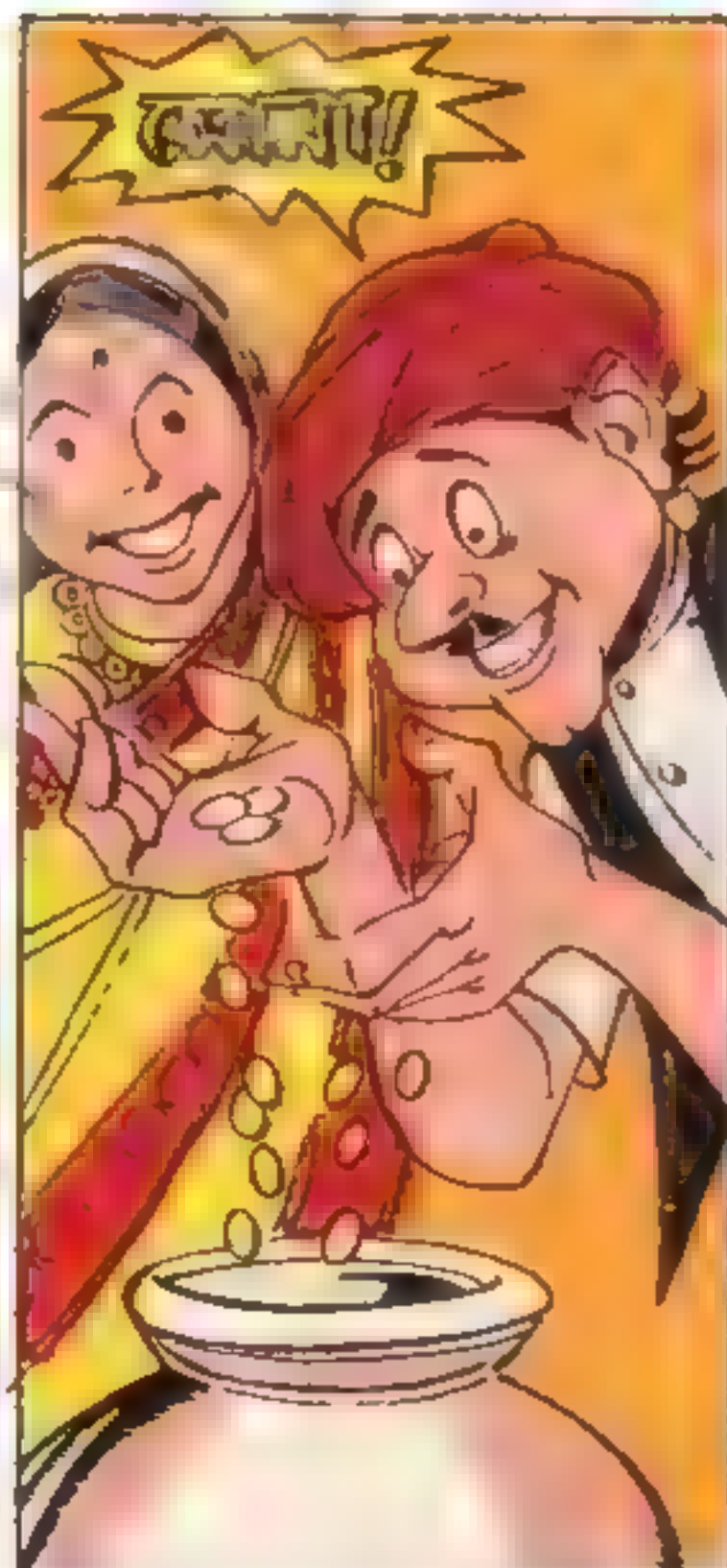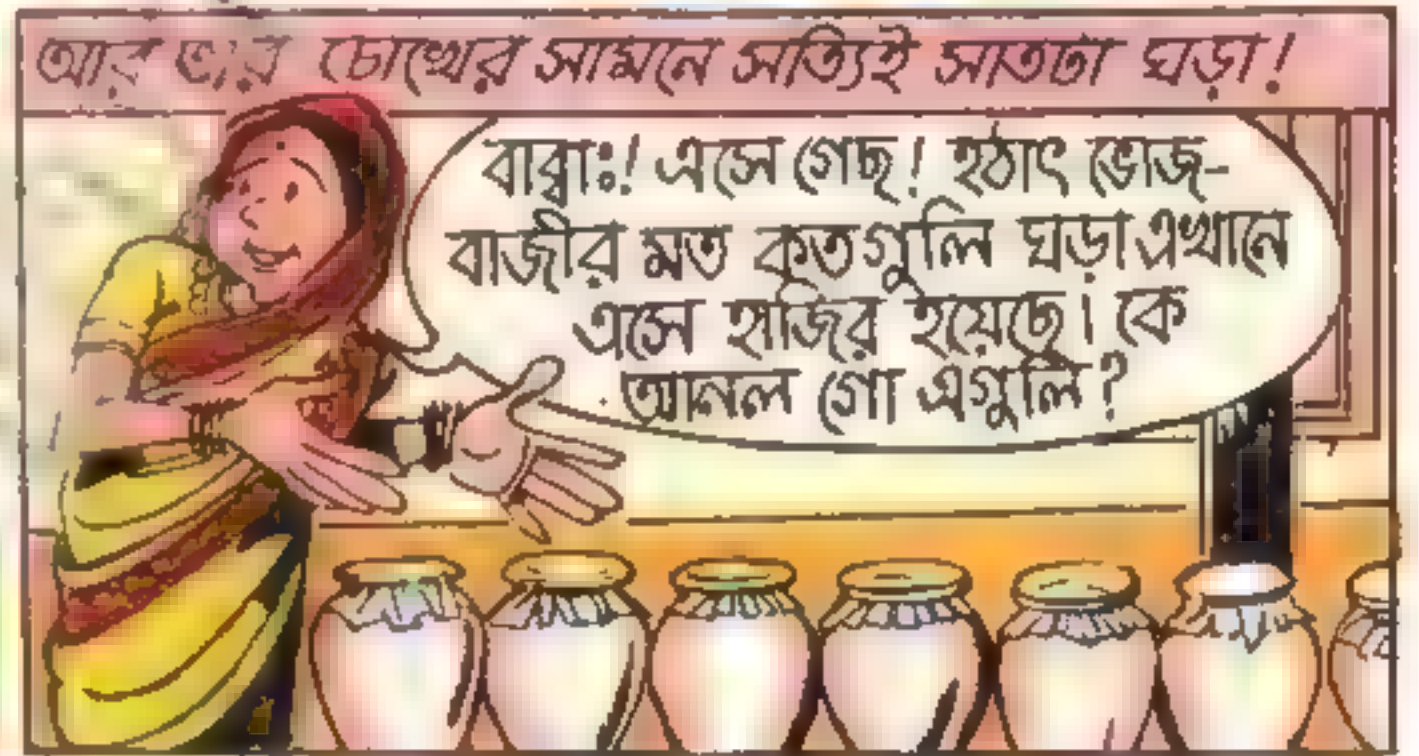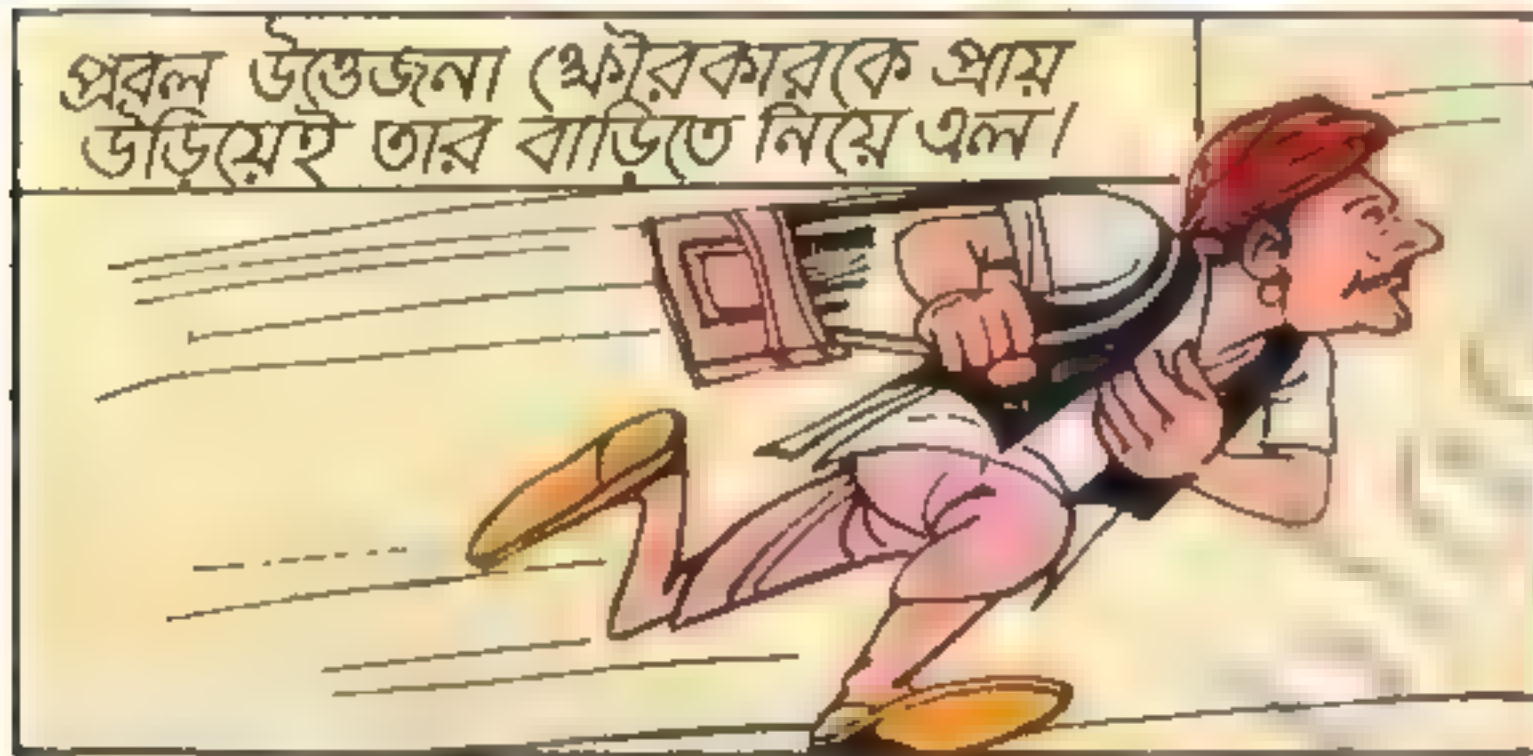
সংসার চালাবার সমস্ত টাকাগুলি বদলে ক্ষৌরকার সোনার টাকা করিয়ে আনল। কিন্তু তাতেও শেষ ঘড়াটা ভরল না।
আরও অনেক লাগবে, অনেক। জমানো টাকার থলিটা নিয়ে এস শিগ্‌গীর!

সারা বছরের সঞ্চয়ও সেই ভুতুড়ে ঘড়ার পেটে ঢালা হল। কিন্তু অবাক কান্ড —
অদ্ভুত ঘড়া তো? বারবার সোনা ঢালছি তবু সেই একই হাল!
এই প্রথম ক্ষৌরকারের কপালে অশান্তির ভাঁজ দেখা দিল।

সে বন্ধুদের থেকে ধার করতে শুরু করল।
এ মাসে দারুণ টানাটানি যাচ্ছে। কিছু ধার দিতে পার ভাই?
বল কি হে? তুমি ধার চাইছ? বিশ্বাসই হচ্ছে না! যাক গে ... তোমার দরকার যখন, সাধ্যমতো নিশ্চয়ই দেব।

এবার সে রাজার কাছে গেল।

মহারাজ, সংসার চালানো যে দায়! আপনি যদি দয়া করে ...

ওহো! বুঝেছি! এত চিন্তার কি আছে? এ-মাস থেকে না হয় দুই থলি করে সোনা দেব তোমাকে।
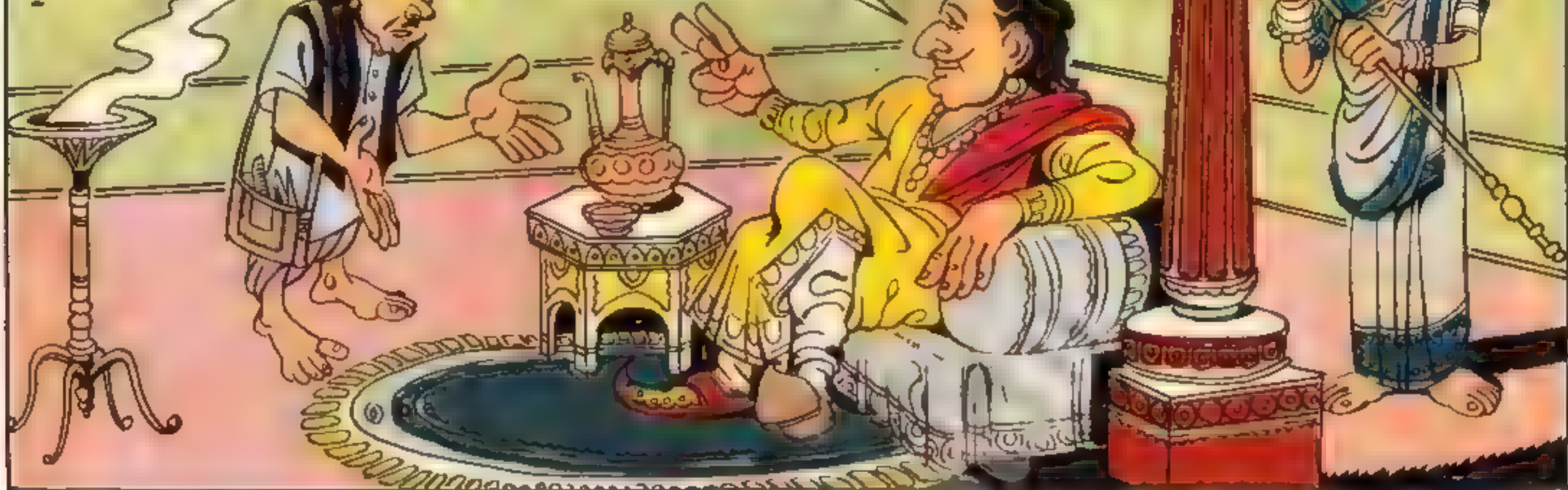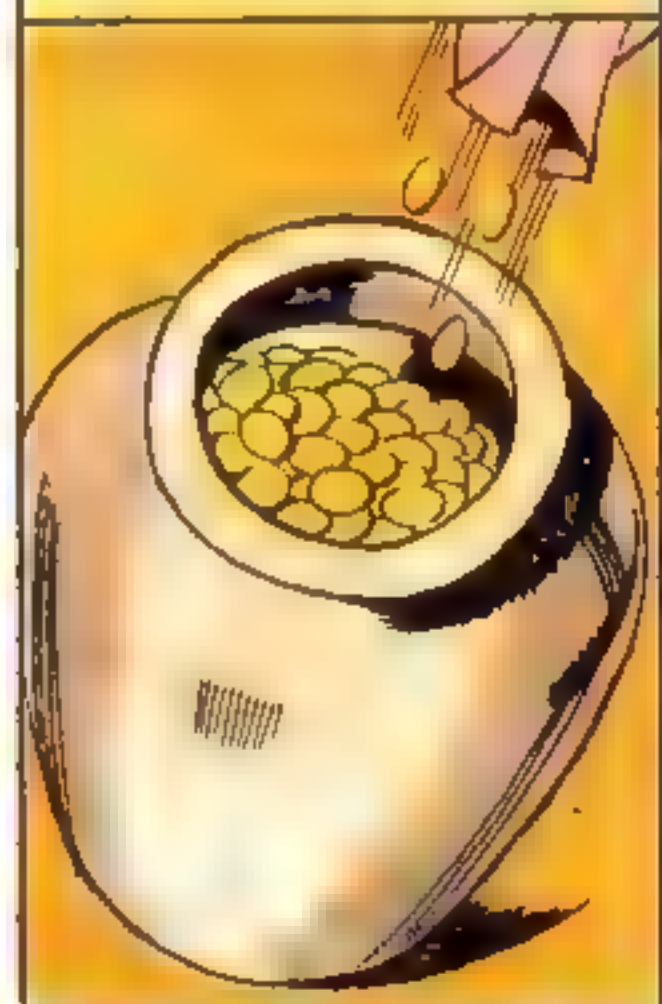
··· নিছকই ভস্মে ঘি ঢালা। যতই ঘড়াটার পেটে সোনা ঢালা হয়, তার খিদে ততই হু-হু করে বাড়তে থাকে।
এই ঘড়াটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে! এটাকে ভর্তি না করে আমার শান্তি নেই!

ফলতঃ—
পেট ভরল না, মা গো! আর একটু দাও না?
আর যে কিছুই নেই, বাবা!

রাত্রে—
ভোর হতে চলল, তুমি এখনও দু'চোখের পাতা এক করলে না?
আঃ! বিরক্ত করো না।

গোরুটা বেচে দিলে কেমন হয়? রূপোর বাসনগুলিই বা ছাই কোন কাজে লাগে? বাচ্চাগুলির গায়ে যে দু'চার টুকরো সোনা...

সারাক্ষণ তার মাথায় একই চিন্তা! এদিকে রাক্ষুসে ঘড়াটা সারা সংসারের শান্তি গ্রাস করে চলল —
কিছুতেই ভরছে না! হায় ভগবান! দুনিয়ায় আমার মতো অসুখী আর কে আছে?

ক্ষৌরকারের এই অশান্তি কিন্তু রাজার চোখ এড়াল না। তিনিও খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন।
ওহে ক্ষৌরকার ভায়া, তুমি যখন এখনকার অর্ধেক মাইনে পেতে, তখনও কত হাসিখুশি আর আমুদে ছিলে!

এখন দেখছি সারাক্ষণ তোমার মুখ ভার! তোমার এই দুর্দশার কারন কি? তুমি কি সেই সাত ঘড়া সোনার খপ্পরে পড়েছ?

আশ্চর্য তো! আপনি জানলেন কী করে?
তোমার মুখে যে বিভীষিকার ছাপ ফুটে উঠেছে, তা আমার একটু চেনা চেনা লাগছে!

এক রাতে, জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে, যক্ষটা আমাকেও লোভ দেখিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সোনাগুলি খরচ করতে পারব তো? নাকি শুধুই জমাতে হবে?
সে কী বলল?

কিচ্ছু না। তখুনি পালিয়ে গেল। সে বুঝেছিল যে আমি তাকে চিনে ফেলেছি। ওই শয়তানের কাজই হল মানুষকে প্রলুব্ধ করা। সপ্তম ঘড়াটা হল প্রলোভনের ফাঁদ। এর লালসা মেটাবার সাধ্য কারও নেই!

ওঃ! কি বোকাই না বনেছি!

সে তখুনি জঙ্গলে ছুটল।
হে যক্ষ! আমাকে দয়া কর। তোমার ঘড়াগুলি আমি আর চাই না — ও গুলি ফিরিয়ে নাও।

ঠিক আছে! বাড়ি ফিরে যাও। ঘড়াগুলিকে আর দেখতে পাবে না।
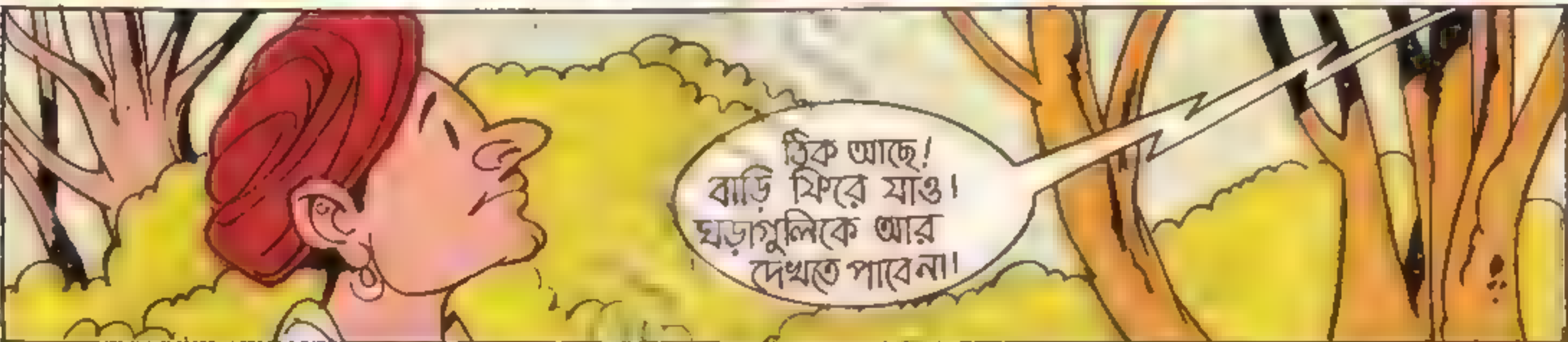
বাড়ি ফিরেই —
সত্যি সত্যিই গেছে তাহলে! আঃ! আমার ঘাড় থেকে একটা পাহাড় নেমে গেল।
কিন্তু এত দিন ধরে তিলে তিলে যা আমরা জমিয়েছিলাম, তার কিছুই যে আর রইল না!

কেঁদো না! আমার শরীর ও মন এখনও শক্ত আছে। আবার সব কিছু নতুন করে হবে। এত দিনে বুঝলাম, সাদাসিধে জীবনই সবচেয়ে বড়। সেখানেই আসল শান্তি, আসল সুখ...

কুয়ো খোঁড়া
একদিন একটি লোক কুয়ো খুঁড়তে বেরল।

পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে সে কাজ শুরু করে দিল।
লা, লা, লা, লা...

থুঃ! জলের কোনো চিহ্নই নেই।

একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই, পরে আবার শুরু করা যাবে।

ঠিক তখনি একটি লোককে দেখা গেল।
এই যে ভাল মানুষের পো, এখানে কী করতে...?
কুয়ো খুঁড়ছি মশায়! পনের হাত খুঁড়ে ফেলেছি, কিন্তু...

এহে-হে! আমার দেখছি আরও আগেই আসা উচিত ছিল, ঠিক জায়গাটা আগেই দেখিয়ে দিতাম। যাক গে, এসো আমার সঙ্গে।

এসে গেছি! চোখ-কান বুজে খুঁড়তে শুরু করে দাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল পেয়ে যাবে।
অনেক ধন্যবাদ! আমি এখুনি শুরু করে দিচ্ছি।

সেই মতো-

কয়েক ঘন্টা পর—
উ-উফ্! কুড়ি হাত হয়ে হয়ে গেল! আর লোকটা কিনা বলে গেল কয়েক মিনিটেই জল পেয়ে যাব! মিনিট! হাঃ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উদয় হল।
কুয়ো খুঁড়ছো বুঝি? এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে কিনা মরতে এখানে এলে? আমি তোমাকে সবচেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।

এই জায়গাটা! কোদাল ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই দেখবে স্রোতের মতো বেগে জল উঠতে শুরু করবে।
বাঁচালেন! এবার খাটুনি সার্থক হবে মনে হচ্ছে!

এবং আরও কয়েকঘন্টার হাড়-ভাঙা খাটুনির পর —
তিরিশ হাত! স্রোতের মতো বেগে জল বেরচ্ছে ঠিকই —সে হল আমারই গায়ের ঘাম! ওঃ! আর পারছি না।

জলের দেখা না মিললে কি হবে, পরামর্শ দেওয়ার লোকের অভাব নেই! আরেক পথিকের পরামর্শে…
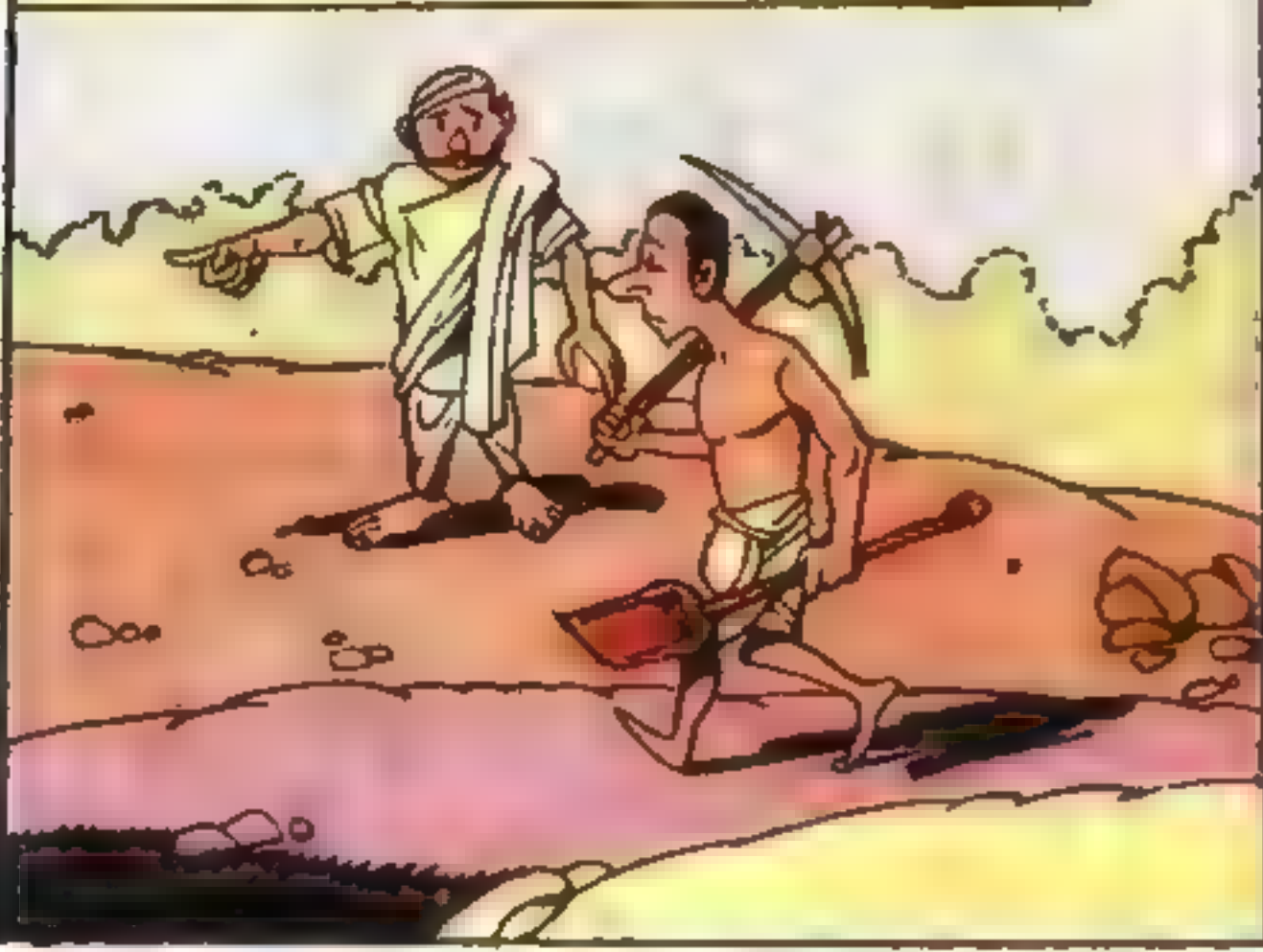
লোকটি আরেক জায়গায় কুড়ি হাত গর্ত খুঁড়ে ফেলল।
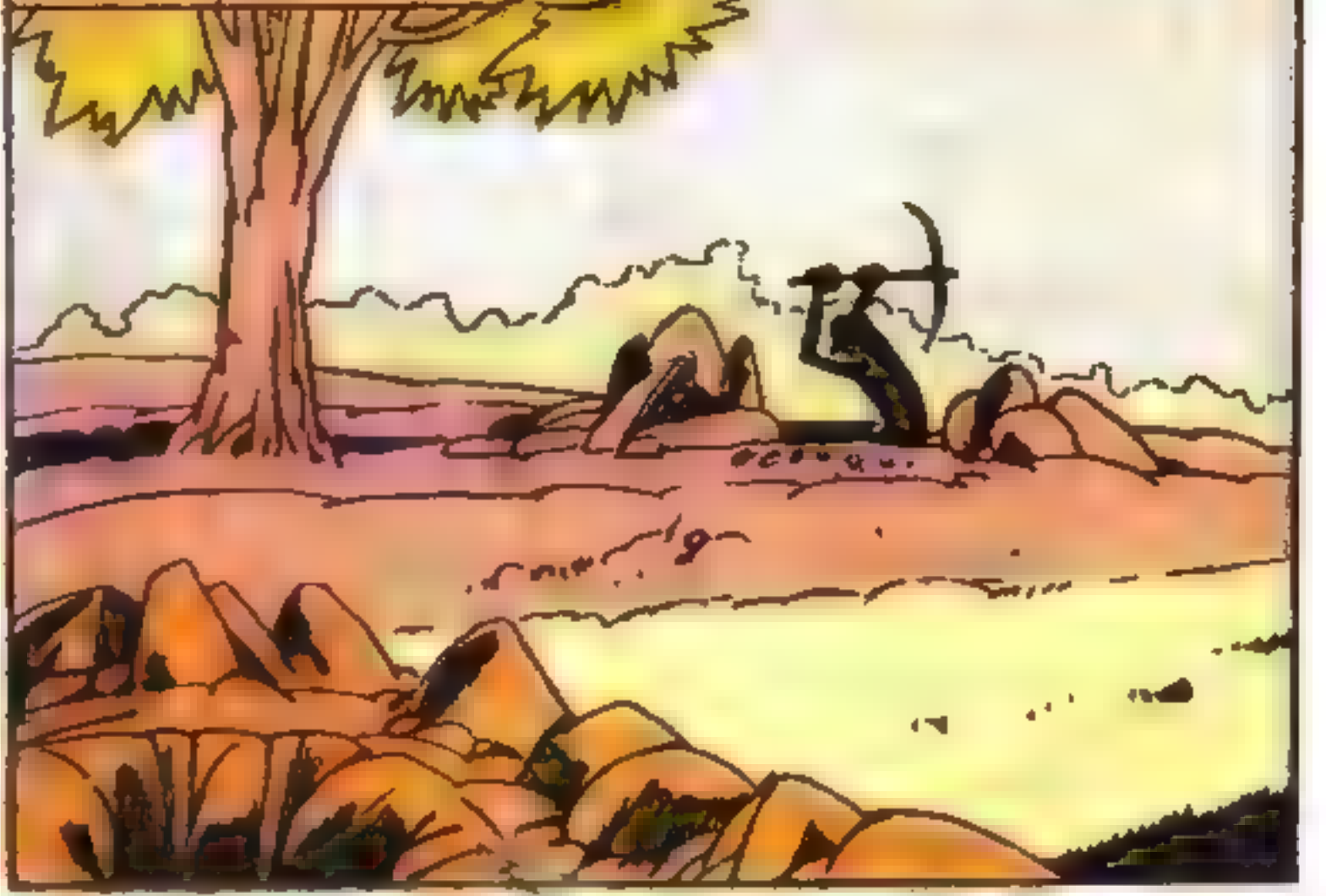
কিন্তু—
এক ফোঁটাও না! আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে!

ঠিক তখনই এক বন্ধুর সাথে তার দেখা হয়ে গেল। তাকে সব কথা খুলে বলতে—
বোঝ তাহলে! আমি সব মিলিয়ে প্রায় পঁচাশি হাত মাটি খুঁড়েছি!
বল কি হে!

যদি তুমি একই জায়গায় ঐ পঁচাশি হাত গর্ত খুঁড়তে, তাহলে এখানকার যে কোন মাটিতে, এমন কি পাথুরে জমির নিচেও জল পেয়ে যেতে!
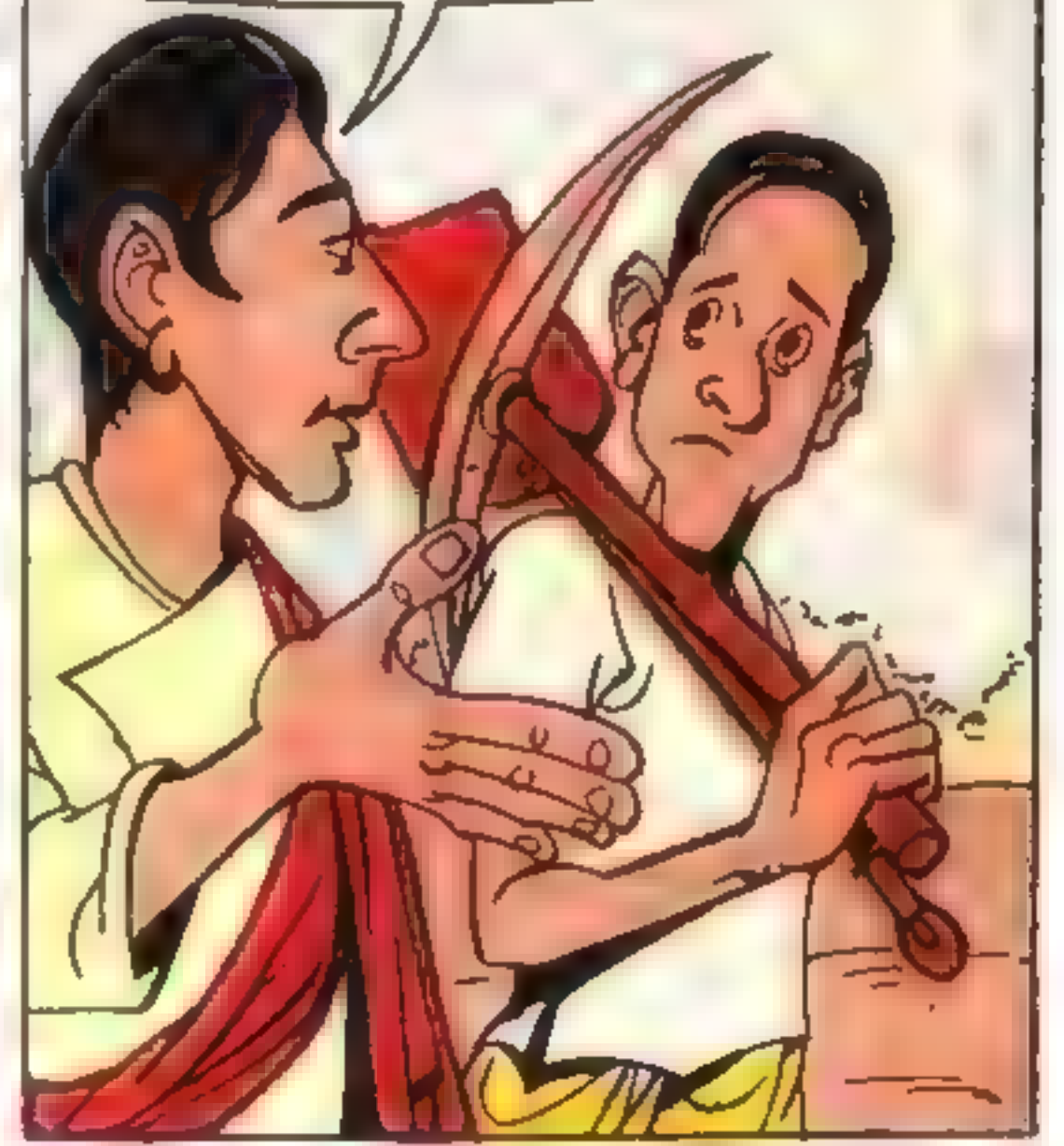
বন্ধু খাঁটি কথা বলেছে। এর থেকে একটা শিক্ষাও পাওয়া গেল। কাল থেকে আবার কুয়ো খুঁড়তে শুরু করব—একই জায়গায়। কারও কথায় কান দেব না।
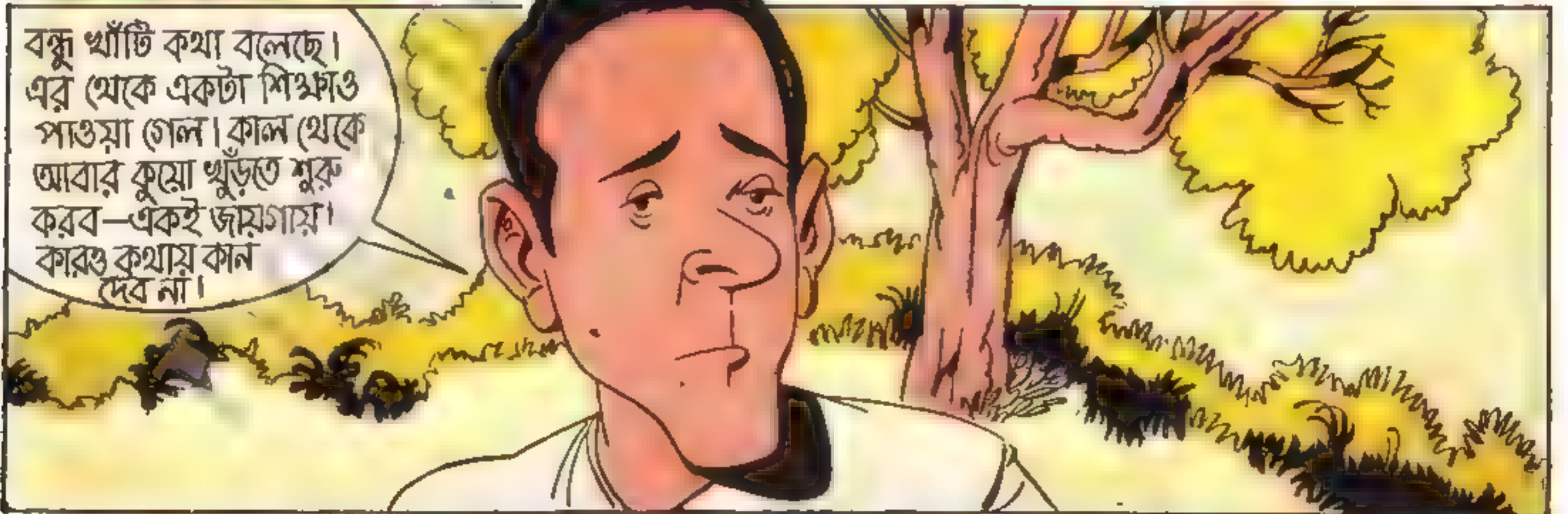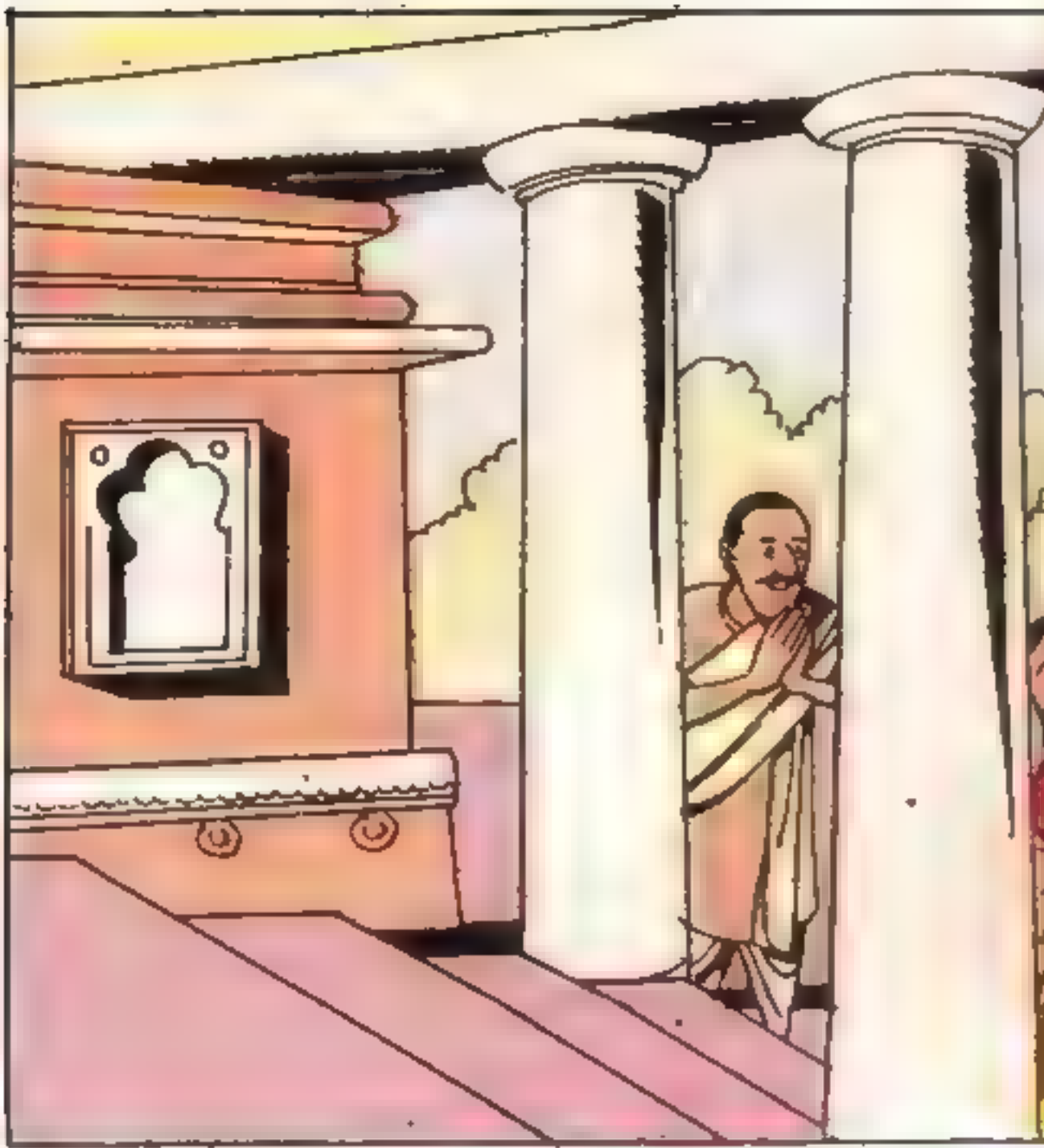
বড় লোকের ঠাকুরপুজো
এক সময়ে এক ধনী লোক ছিলেন। সবাই তাঁকে চিনতো দুর্গা ঠাকুরের খুব ভক্ত বলে।

প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোর সময় তিনি জাঁকিয়ে ভোজের আয়োজন করতেন।
দেবীর জন্য সব চেয়ে ভাল ভোগ চাই। একেবারেই কার্পন্য করো না।
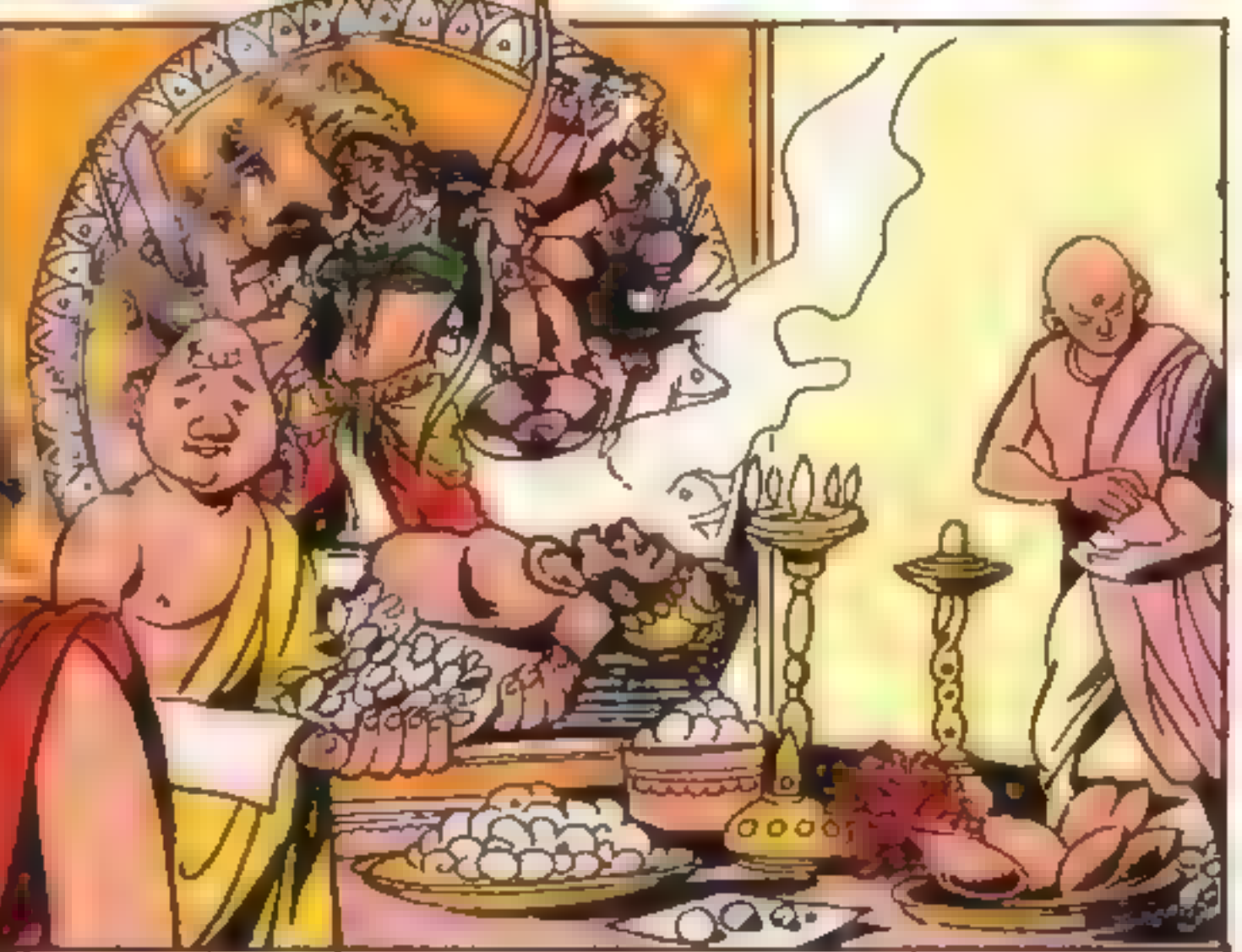
রান্নার আয়োজন দেখতে সারা গাঁ ভেঙে পড়ত।
কত বস্তা চাল আর চিনি আসছে দেখছেন?
আর ঘিয়ের কলসি! গুনে শেষ করা যায় না। ভদ্রলোকের ভক্তি আছে বটে!

এ ভাবেই বহু বছর কেটে গেল। এখন ভদ্রলোক বৃদ্ধ হয়েছেন।

শেষে এক বছর—
উনি এবার আর পুজো করছেন না!
ব্যাপারটা কী?

চলুন না, জিজ্ঞেস করেই দেখি।

মহাশয়, একটা কথা জানার বড়ই কৌতুহল হচ্ছে। আগে আপনি কত ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করতেন! সেই বস্তা বস্তা চাল... কলসি কলসি ঘি...কিন্তু এবার সব বন্ধ করলেন কেন?

বুড়ো হয়েছি। দাঁতও সব পড়ে গেছে—হজমশক্তিও আর নেই। গুরুপাক এখন আর সহ্য হয় না।

ওঃ! তাহলে দুর্গা মায়ের জন্য নয়, এতদিন নিজের জন্যই অত ভোগের আয়োজন করতেন!
তাহলে তো বেশ বড় ভক্ত বলেই ওনাকে চেনা গেল!
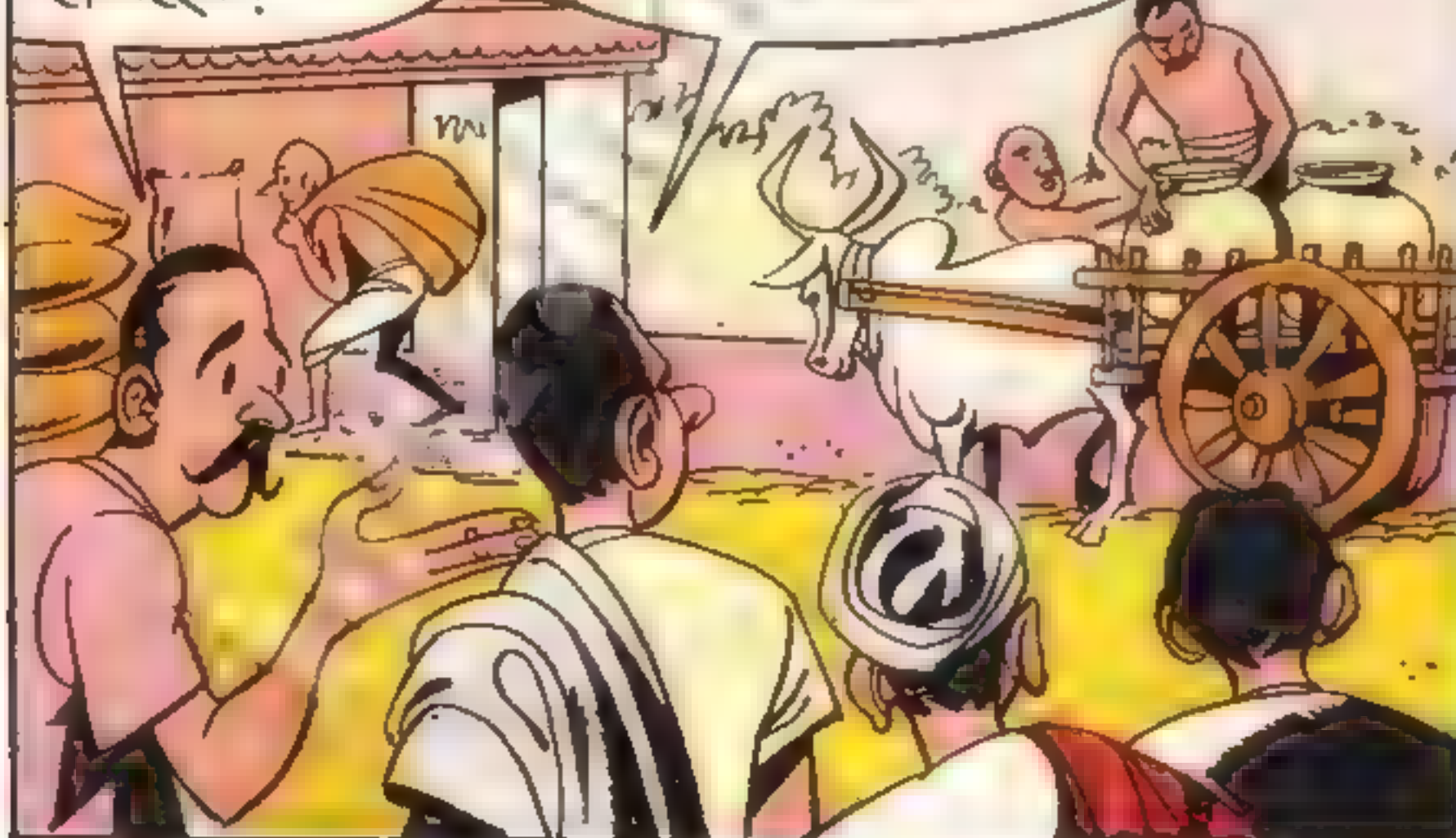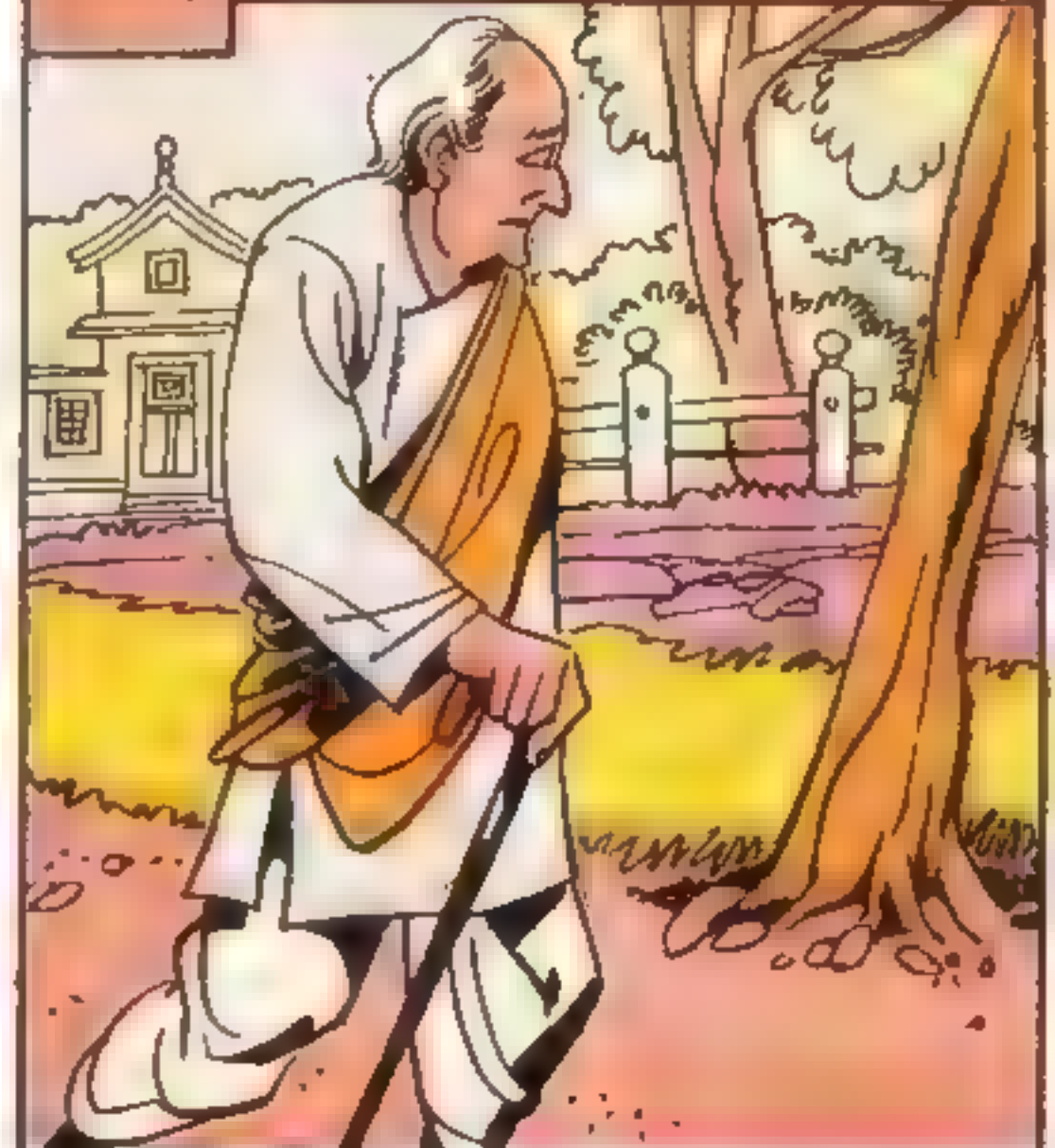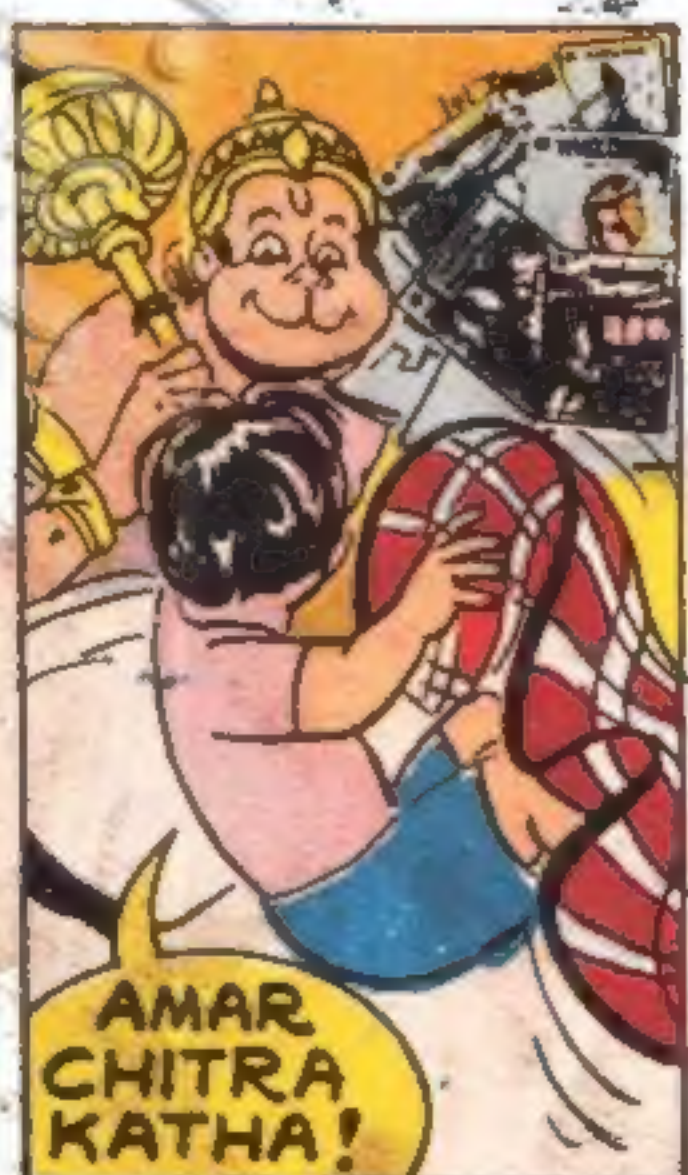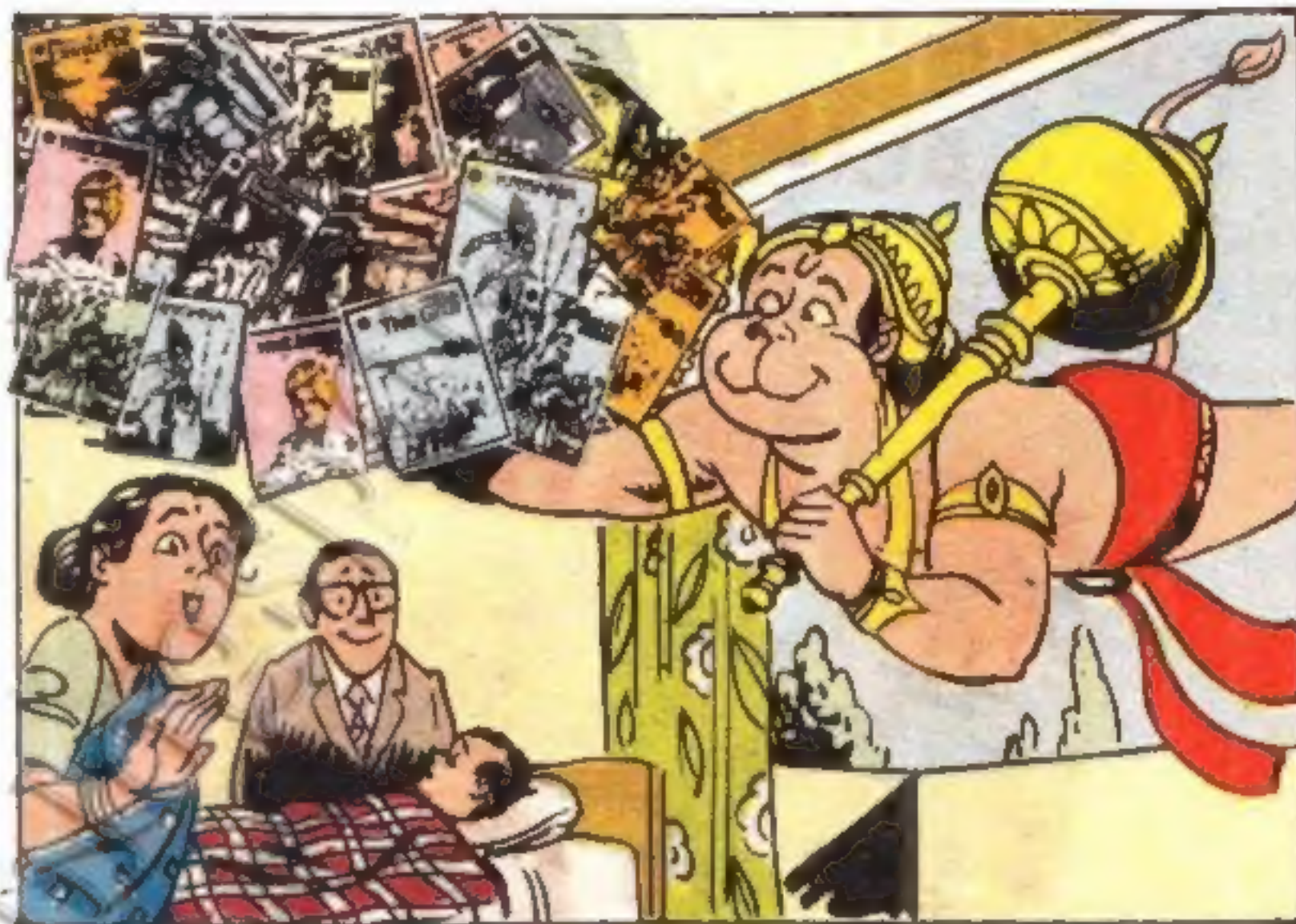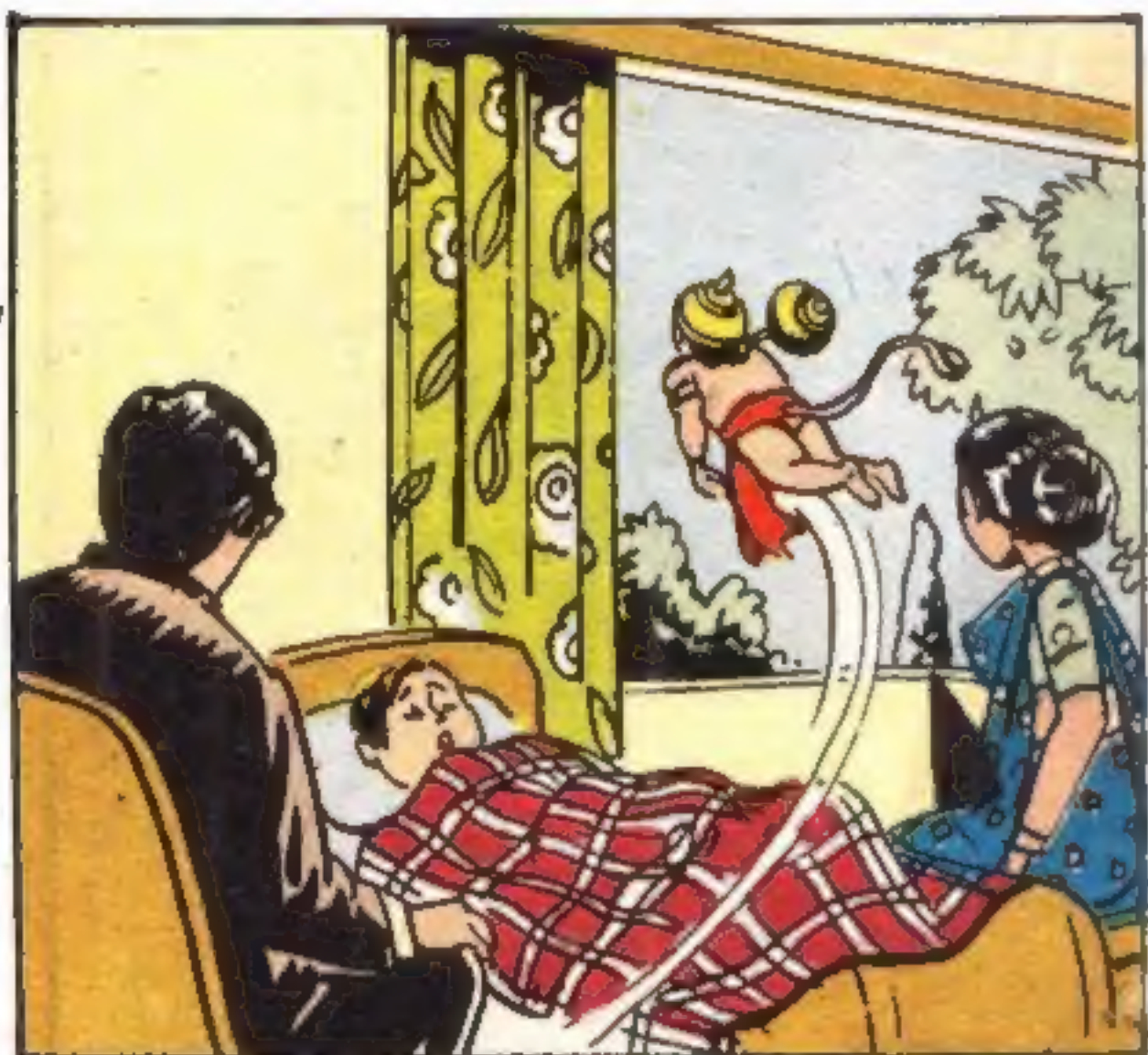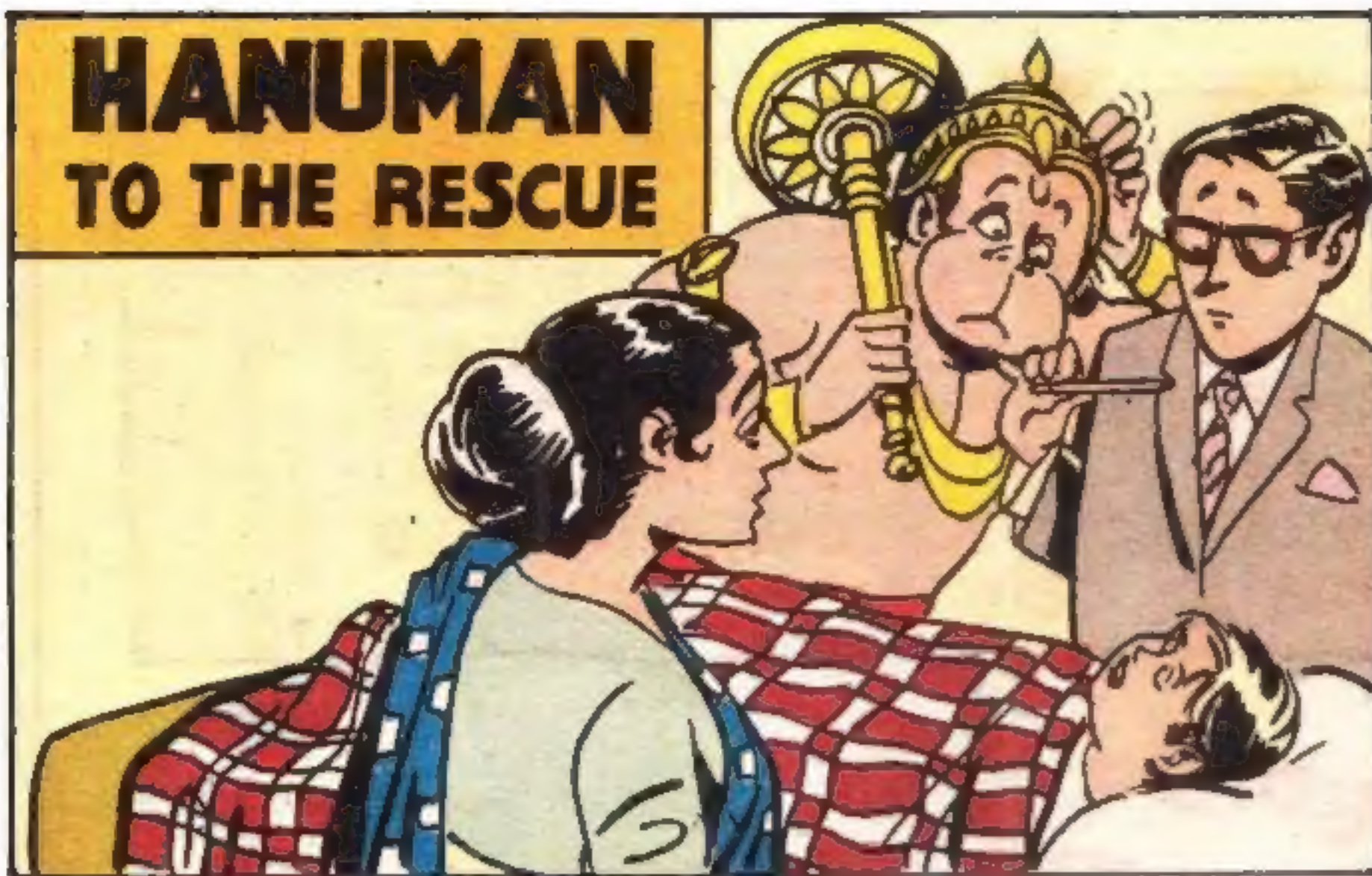
You don't have to fall ill to get Amar Chitra Katha!
Nor do your need Hanuman to get you Amar Chitra Katha.
Amar Chitra Katha are available everywhere, at Rs.3.50 per copy.
Distributed by: **India Book House**

VALMIKI'S RAMAYANA IS BELIEVED TO BE THE FIRST POETIC WORK WRITTEN IN SANSKRIT; IT IS, THEREFORE, REFERRED TO AS THE ADIKAVYA. IT IS SAID THAT BRAHMA ASSURED VALMIKI THAT "AS LONG AS THE MOUNTAINS STAND AND THE RIVERS FLOW, SO LONG SHALL THE RAMAYANA BE READ BY MEN."